ছোটদের

কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাস

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর
সম্পাদিত

চ্ছদ :
শ্রীধীরেন বল

ছবি :
শ্রীমানস ভট্টাচার্য

মুদ্রাপক :
শ্রীসুকুমার চৌধুরী
বাণী-শ্রী প্রেস
৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
মোহন প্রেস
২, করিস চার্চ লেন
কলিকাতা—৯

ব্লক :
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং
১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৯

বাইণ্ডার্স :
ব্যানার্জী এণ্ড কোং
১০১, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা—৯

প্রকাশক :
শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল
১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৯

ক্যালক্যাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ—১৯৫৩

বাঁধাই—২॥০

4078



কৃত্তিবাস ওঝা

পূর্বাঞ্চল রেলপথে নদীয়া জেলার অন্তর্গত রানাঘাট একটি বড় স্টেশন। সেখান থেকে সাড়ে তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে গেলে ফুলিয়া নামে একটি গ্রাম পাওয়া যায়। এই গাঁয়ে প্রায় ছ'শো বছর আগে কৃত্তিবাসের জন্ম হয়। কৃত্তিবাস লিখেছেন :

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস।
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥

এখনকার পণ্ডিতেরা অনেক হিসাব করে কৃত্তিবাসের জন্মের সাল-তারিখ বাহির করে ফেলেছেন : ইংরাজী ১৪৩২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী। আবার কেউ বলেন—ওটা ভুল, ইংরাজী ১৪০০ সালে তাঁর জন্ম।

কৃত্তিবাসের মায়ের নাম ছিল মালিনী দেবী, বাবা ছিলেন বনমালী ওঝা। ঠাকুরদা' মুরারি ওঝা ছিলেন মস্তবড় পণ্ডিত, তিনিই নাতির নামকরণ করেছিলেন কৃত্তিবাস।

……………………পিতামহের উল্লাস।
কৃত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ॥

উপাধ্যায় পণ্ডিতের বংশ, ছেলে তো আর মূর্খ হয়ে থাকতে পারে না। বারো বছর হতেই একদিন শুক্রবার প্রত্যূষে বাড়ীঘর ছেড়ে বাহির হয়ে পড়তে হোল। যশোহরে বুড়িগঙ্গার তীরে এক পণ্ডিতের গৃহে তাঁর পড়াশুনা সুরু হোল।

গুরুগৃহে কৃত্তিবাস কতদিন ছিলেন তা জানা যায় না, তবে তখনকার রীতি অনুযায়ী সম্ভবতঃ বারো বছরই হবে। পড়াশুনায় তিনি খুব ভালো ছেলে ছিলেন, মুখে-মুখে নানা ছন্দের নানা শ্লোক রচনা করতেন সেইজন্য গুরু তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। পাঠশেষে যেদিন গুরুগৃহ থেকে বিদায় নিলেন, সেদিন গুরু আশীর্বাদ করে বললেন—তুমি রাজ-পণ্ডিত হও!

রাজ-পণ্ডিত হওয়াটা অবশ্য কৃত্তিবাসের বংশে নূতন নয়। মুরারি ওঝা, ভৈরব ওঝা, সূর্য ওঝা প্রভৃতি এক সময় গৌড়েশ্বরের সভাপণ্ডিত হয়েছিলেন, কৃত্তিবাসই-বা সে আশা করবেন না কেন? তিনি একদিন রাজদ্বারে এসে উপস্থিত হলেন। পাঁচটি শ্লোক লিখে দ্বারীর হাতে পাঠিয়ে দিলেন রাজার কাছে। রাজা শ্লোক পড়েই পণ্ডিতকে আহ্বান করলেন। সোনার লাঠি হাতে দ্বারী ছুটে এলো, হাঁকলো—ফুলিয়ার মুখুটি বংশের পণ্ডিত কৃত্তিবাস ওঝা কার নাম? মহারাজ ডাকছেন।

কৃত্তিবাস রাজার সভায় এসে দাঁড়ালেন। মাঘ মাস, আঙিনায় মাদুরে বসে রাজা রোদ পোহাচ্ছেন। পার্ষদ ও বয়স্যেরা হাস্য-পরিহাস করছেন। কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের প্রশস্তি গাইলেন সাতটি শ্লোকে। রাজা খুসি হলেন। কৃত্তিবাসের নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করলেন, পরিচয়

হোল। মালা-চন্দন দিয়ে পণ্ডিতের সম্মান করলেন, উপহার দিলেন পট্টবস্ত্র, বললেন—বলুন পণ্ডিত, কি আপনার প্রয়োজন ?

তখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ছিলেন বিদ্যানুরাগী, ঐশ্বর্যের বিলাস তাঁদের মনকে জয় করতে পারতো না। কৃত্তিবাস হেসে বললেন—মহারাজ, অর্থের কোন প্রয়োজন আমার নেই। আপনি আমাকে যে সম্মান দিলেন, অর্থের চেয়ে তার মূল্য আমার কাছে অনেক বেশী।

সভাসদেরা সাড়া তুললেন—সাধু! সাধু!!

রাজা বললেন—সবাই বুঝতে পারে এমন পয়ার-ছন্দে আপনি একখানি রামায়ণ রচনা করুন তাতে আপনার গৌরব বৃদ্ধি পাবে!

রাজাকে আশীর্বাদ করে পণ্ডিত বাহির হয়ে এলেন।

বাল্মীকির সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বাংলা কবিতায় অনুবাদ করা বড় সহজ কথা নয়। এতো বড় কাজে হাত দেবার আগে কৃত্তিবাস ভাবতে বসেন—শেষ অবধি সম্পূর্ণ করতে পারবেন তো ? তা'ছাড়া তখনকার দিনে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা কোন ধর্মশাস্ত্র চলিত-ভাষায় লেখা হয়, তা পছন্দ করতেন না। তাঁরা ভাবতেন তা'তে নাকি বইয়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। সমস্ত ব্রাহ্মণ-সমাজকে বিক্ষুব্ধ করতে কৃত্তিবাস বোধ হয় শঙ্কিত হচ্ছিলেন। তবে গৌড়েশ্বর সহায় ছিলেন, এই যা কথা! পিতা বললেন—কিছু ভেবো না, সুরু করে দাও, শ্রীরামচন্দ্রের আশীর্বাদে সব ঠিক হয়ে যাবে! তাঁর ইচ্ছায় পঙ্গুও পর্বত লঙ্ঘন করে।

মা বললেন—কিছু ভাবিস্ নে, তাঁকে স্মরণ করে কলম ধর্।

কৃত্তিবাস সরস্বতীর নাম করে কলম ধরেন—

রঘুবংশের কীর্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতীর বরে॥

কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণ থেকে কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনেক স্থলে ভিন্নরূপ গ্রহণ করে। লঙ্কাকাণ্ডে রাবণের পুত্র বীরবাহু ও তরণীসেন যখন শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন তখন তাঁরা শ্রীরামচন্দ্রের স্তব করছেন। বীরবাহু সম্পর্কে কবি লিখেছেন:

ধরণী লুটায়ে রহে যুড়ি দুই কর।
অকিঞ্চনে কর দয়া রাম রঘুবর॥

শুধু রাম-লক্ষ্মণকেই নয়, বীরবাহু—'প্রণমিল ভক্তবৃন্দ যত কপিগণে।'

আবার তরণীসেন সম্বন্ধেও কৃত্তিবাস লিখেছেন—

চিন্তা করি মনে মনে বলিছে তখন।
শ্রীচরণে স্থান দেও কৌশল্যা-নন্দন॥
রাবণ-সন্তান বলি দয়া না করিবে।
দয়াময় রাম নামে কলঙ্ক রহিবে॥

শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে এসে কেউ যে এমন ভাবে মনে মনে শত্রুর পূজা করতে পারে, বাল্মীকি তা জানতেন না, কৃত্তিবাসও বাল্মীকির রামায়ণ অনুবাদ করতে গিয়ে এই কাহিনী কোথায় পেলেন, তা জানা নেই। সেইজন্য পণ্ডিতরা বলেন, লঙ্কাকাণ্ডের এইসব অংশ কৃত্তিবাসের লেখা নয়। আগেকার দিনে তো আর ছাপাখানা ছিল না, পুঁথি হাতে লিখে দেশ-বিদেশে পাঠানো হোত, বংশপরম্পরায় রক্ষিত হোত। যাঁরা কৃত্তিবাসের পুঁথির নকল করেছেন তাঁরাই পরে এইসব কাহিনী মূল বইয়ের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। বৈষ্ণবেরা শ্রীরামচন্দ্রকে বিষ্ণু-অবতার বলে মনে করেন, তাঁরা ভক্তি ও ভালবাসার সাধনা করেন সম্ভবতঃ সেইজন্য তাঁরা রাবণের পুত্রকে দিয়ে রামের অনুচর বানরদেরও প্রণাম করিয়ে ছেড়েছেন।

শাক্তরাও বাদ যান নি। তাঁদের হাতে যখন রামায়ণ নকল করার ভার এলো, তখন তাঁরাও চণ্ডী-পূজার এক কাহিনী জুড়ে দিলেন। যুদ্ধের সময় দশভুজার পূজা করতে গিয়ে নীলোৎপল হারিয়ে গেল। শ্রীরামচন্দ্র কমল আঁখির কমলাক্ষ দিয়ে তা পূরণ করতে গিয়ে দেবীকে প্রসন্ন করলেন। বাল্মীকির রামায়ণে এই কাহিনী নেই।

আবার পূর্ববঙ্গে কৃত্তিবাসের যে সব পুঁথি পাওয়া যায় তা'তে বীরবাহু, তরণীসেন, চণ্ডীপূজা—কিছুই নেই। তা'তে মনে হয় পণ্ডিতেরা ঠিক কথাই বলেছেন।

রামায়ণ শেষ করে কৃত্তিবাস মহারাজকে শুনিয়েছিলেন কি না আমাদের জানা নেই। তবে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা তাঁকে 'সর্বনেশে' নাম দিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন। তাঁরা তখন ভাবেননি যে এই সর্বনেশে কবির নাম শত-শত বছর ধরে বাংলার ঘরে-ঘরে বেঁচে থাকবে। কোন্ রাজা কৃত্তিবাসকে রামায়ণ লিখতে অনুরোধ করেছিলেন তা নিয়েও আজকাল বিতর্ক আছে—কেউ বলেন তিনি কংসনারায়ণ, কেউ বলেন তিনি রাজা গণেশ। তা সে তিনি যিনিই হোন, কৃত্তিবাস সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায় না। তিনি কোথায় বিবাহ করেছিলেন, তাঁর ছেলে-মেয়ে কেউ ছিল কি না, ছ'শো বছরের মধ্যে মানুষ তা ভুলে গেছে। অতবড় কবি কত বছর বয়সে কোথায় মরেছিলেন, তার খবরও কেউ রাখে না। এখন শুধু আছে জঙ্গলাকীর্ণ ফুলিয়া গ্রাম, আর সেই গাঁয়ের মাঝে একটি মাটির ঢিবি দেখিয়ে লোক বলে—কৃত্তিবাসের দোলমঞ্চ।

কৃত্তিবাসের জীবন-কথা বাঙ্গালী ভুলে গেছে, কিন্তু ছ'শো বছর ধরে তাঁর নাম বাংলার ঘরে-ঘরে অমর হয়ে আছে। কবি বেঁচে আছেন তাঁর কাব্যের ভিতর দিয়ে—যতদিন বাঙ্গালী জাতি থাকবে ততদিন কবি কৃত্তিবাস অমর হয়ে থাকবেন।

ছোটদের

কৃত্তিবাসী রামায়ণ

আদিকাণ্ড

অনেক অনেক দিন আগে অযোধ্যায় দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন—

রাজ্য করে দশরথ যেন পুরন্দর।
পুত্র তুল্য পালে প্রজা মহা ধনুর্ধর॥
পরম সুন্দর রাজা রাজ চক্রবর্তী।
দশরথ তুল্য নাহি ভূমিতে ভূপতি॥

কিন্তু রাজার মনে বড় কষ্ট; রাজার কোন পুত্র নেই, কে তাঁর পরে রাজা হবে!

একদিন রাজা গেলেন মৃগয়া করতে।—

হস্তী, ঘোড়া রাজার চলিল শতে শতে।
মৃগ অন্বেষিয়া রাজা বেড়ান বনেতে॥

কিন্তু শিকার আর মেলে না, শেষে রাজা ক্লান্ত হয়ে এক সরোবরের তীরে এক গাছের তলায় বিশ্রাম করতে বসলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনিয়ে আসছে, কিছুই ভালো দেখা যায় না, এমন সময় রাজা শুনতে পেলেন পুষ্করিণীতে জল পানের শব্দ। রাজা শব্দভেদী বাণ

জানতেন, শব্দ লক্ষ্য করে বাণ ছুটতো। রাজা শব্দভেদী বাণ ছাড়লেন সেই শব্দ লক্ষ্য করে। রাজা ভেবেছিলেন হরিণ জল পান করতে এসেছে, কিন্তু—

অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধু নাম ধরে।
কলসীতে জল ভরে সেই সরোবরে॥
কলসীর মুখ করে বুক্, বুক ধ্বনি।
রাজা ভাবে, জলপান করিছে হরিণী॥
মৃগজ্ঞানে বাণ হানে রাজা দশরথ।
বাণাঘাতে পড়ে মুনি প্রাণ ওষ্ঠাগত॥
মৃগের উদ্দেশে রাজা যান দৌড়া দৌড়ি।
মৃগ নহে মুনিপুত্র যায় গড়াগড়ি॥
দেখেন সিন্ধুর বুকে বিদ্ধ আছে বাণ।
অতি ভীত দশরথ, উড়িল পরাণ॥

নিপুত্র রক্তবমি করে মারা গেলেন, মৃত্যুর আগে তিনি দশরথকে বলে গেলেন—

অন্ধ পিতা, মাতা মম শ্রীফলের বনে।
আজি তাঁরা মরিবেন আমার বিহনে॥
এই বড় দুঃখ মম রহিল যে মনে।
মৃত্যুকালে দেখা না হইল দোঁহা সনে॥
এই সত্য, দশরথ, করহ আপনে।
আমা লইয়া যাও পিতা মাতার সদনে॥

মৃত ঋষিকুমারকে কোলে নিয়ে রাজা গেলেন অন্ধক মুনির আশ্রমে। মুনিতো অন্ধ, শুকনো পাতায় পায়ের শব্দ শুনে ভাবলেন পুত্র আসছে!

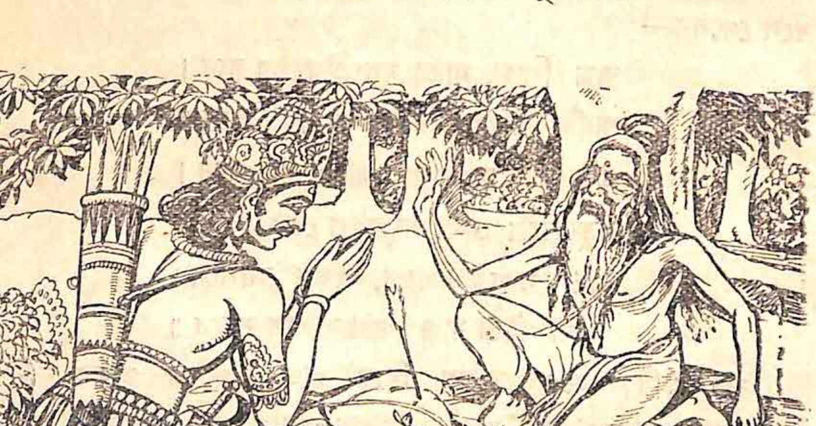
চক্ষু নাই মুনির দেখিতে না পায়।
আইসহ, পুত্র, বলি ডাকে উচ্চ রায়॥

কিন্তু দশরথ সহসা কোন সাড়া দিতে পারেন না।

দেখিতে না পায় মুনি, বসিলেন ধ্যানে।
সকল বৃত্তান্ত মুনি ক্ষণেকেতে জানে॥
চক্ষু ভাসে নীরে, করে করাঘাত শিরে।
বলে, রাজা মারিয়াছে পুত্রে এক তীরে॥
মুনি বলে, এস, দশরথ নরপতে।
মৃত পুত্র আনিলে আমাকে দেখাইতে॥
আর কিবা, দশরথ, শাপিব তোমাকে।
এই মত প্রাণ তব যাক পুত্রশোকে॥

রাজার কোন পুত্র ছিল না, রাজা বললেন—

তব শাপে মুনি মম হরষ অন্তর।
শাপ নহে, হইল আমার পুত্রবর॥



মুনি বললেন—

আমার শাপের, রাজা, পাইবে প্রমাণ।
শাপে বর হইল, হইবে পুত্রবান॥
এই সত্য, দশরথ, করিবে পালন।
ঋষ্যশৃঙ্গে আনি কর যজ্ঞ আরম্ভন॥

অন্ধক মুনি পুত্রশোকে দেহত্যাগ করলেন। দশরথ ফিরে এলেন অযোধ্যায়।

রাজার মনে ছিল দুঃখ।—

অপুত্রক আমি, মনে পাই বড় দুঃখ।
প্রভাতে না দেখে লোক অপুত্রের মুখ॥

অন্ধক মুনির কথা মত রাজা গেলেন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির কাছে। মুনিকে নিয়ে এলেন অযোধ্যায়। আয়োজন করলেন অশ্বমেধ যজ্ঞের।

এক বছর লাগলো অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষ করতে। তারপর রাজা সুরু করলেন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ।—

আতপ-তণ্ডুল, তিল, যব, রাশি, রাশি।
একে একে দিল ঘৃত কলসী কলসী॥



ঋষ্যশৃঙ্গ দিল তবে যজ্ঞেতে আহুতি।
যজ্ঞ হৈতে উঠে চরু বিষ্ণুর আকৃতি॥

আগুনের মধ্যে থেকে পায়স-পূর্ণ থালা মুনি তুলে নিলেন, দশরথের হাতে দিয়ে বললেন—এই পায়স রানীদের খেতে দিন, আপনার মনস্কাম পূর্ণ হবে!

রাজা পায়স নিয়ে গেলেন অন্তঃপুরে। রাজার তিন রানী। প্রথমে গেলেন বড় রানী কৌশল্যার কাছে, পায়সের অর্ধেক তাকে দিয়ে বললেন—এ থেকে অর্ধেক তুমি সুমিত্রাকে দিও। তারপর গেলেন কৈকেয়ীর কাছে, তাকে অর্ধেক দিয়ে বললেন—এ থেকে অর্ধেক তুমি সুমিত্রাকে দিও। রানীরা রাজার কথামত ভাগ করে খেলেন, তা'তে চারভাগ পায়সের দু'ভাগ সুমিত্রার অংশে পড়লো।

ফলে, চৈত্রমাসের রাম-নবমীর দিন তিন রানীর চার পুত্র হোল, কৌশল্যার এক পুত্র, কৈকেয়ীর এক পুত্র আর সুমিত্রার দুই পুত্র। তেরো দিনের দিন মহর্ষি বশিষ্ঠ এসে কৌশল্যার ছেলের নাম রাখলেন রাম, কৈকেয়ীর ছেলের নাম রাখলেন ভরত আর সুমিত্রার যমজ ছেলের নাম রাখলেন লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন।

দিন যায় রাজকুমারদের বয়স বাড়তে থাকে।

চন্দ্রকলা যেমন বর্ধিত দিনে দিনে।
সেইরূপ লাবণ্য বাড়িল চারিজনে॥
পঞ্চবর্ষ গত রাম, হাতে দিয়া খড়ী।
পড়িতে পাঠান রাজা বশিষ্ঠের বাড়ী॥
ক, খ, গ, আঠার কলা বানান প্রভৃতি।
অষ্ট শব্দ পাঠ করিলেন রঘুপতি॥

ব্যাকরণ, কাব্যশাস্ত্র, পড়িলেন স্মৃতি।
অবশেষে পড়িলেন রাম চতুঃশ্রুতি॥
কোন শাস্ত্র নাহি তাঁর হয় অগোচর।
চৌদ্দদিনে চতুঃষষ্টি বিদ্যাতে তৎপর॥
বিদ্যা পড়ি করিলেন গুরুকে প্রণাম।
অস্ত্রবিদ্যা অতঃপর শিখিলেন রাম॥
প্রাতঃকালে চারি ভাই যান মাল-ঘরে।
মল্লবিদ্যা শিখেন সকলে সমাদরে॥
সূর্যবংশী বালক ধনুক ভাল জানে।
ধনুর্বান হাতে লয়ে বেড়ান কাননে॥
ধনু হাতে করি রাম যারে এড়ে বাণ।
ত্রিভুবনে তাহার নাহিক পরিত্রান॥

রাজা দশরথের দিন সুখেই কাটছিল।—

এইরূপে দশরথ চারি পুত্রে লয়ে।
করেন সাম্রাজ্যভোগ আনন্দিত হয়ে॥

এই সময় একদিন সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে দশরথ গঙ্গাস্নানে গেলেন। কিন্তু পথে ঘটলো বিপত্তি। যে পথ দিয়ে দশরথ লোকজন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যাচ্ছিলেন সেটা চণ্ডালদের দেশ, তাদের রাজা গুহক দশরথের পথ আটকালেন—

গুহক চণ্ডালে বলে, শুন, দশরথ।
ভাঙ্গিয়া আমার দেশ করিলে কি পথ॥
বারে বারে যাও তুমি এই পথ দিয়া।
সৈন্যেতে আমার রাজ্য ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥

গঙ্গাস্নান করিতে তোমার থাকে মন।
আর পথ দিয়া তুমি করহ গমন॥

দশরথ সে কথা শুনলেন না, গুহকের সঙ্গে বেধে গেল যুদ্ধ—

দুইজনে বাণবৃষ্টি করে তবে কোপে।
দোঁহাকার বাণেতে দোঁহার প্রাণ কাঁপে॥
দশরথ রাজা এড়ে পাশুপাত শর।
হাতে গলে গুহকে বান্ধিল নরেশ্বর॥

গুহক তখন দুই পা দিয়ে তীর ছুড়তে সুরু করলো। আশ্চর্য শিক্ষা:—

পায়েতে ধনুক টানে, পায়ে এড়ে বাণ।
দেখিতে কৌতুক রাম গেলেন সে স্থান॥

গুহক ভক্ত লোক, রামকে দেখেই প্রণাম করলো। সব বিবাদ মিটে গেল, অগ্নি সাক্ষী করে শ্রীরাম গুহকের সঙ্গে করলেন বন্ধুত্ব।

এমন সময় একদিন বিশ্বামিত্র মুনি এলেন রাজার সভায়।—

বিশ্বামিত্র বলেন, শুন, হে দশরথ।
শ্রীরামেরে দেহ, যদি হয় অভিমত॥
মুনিগণ যজ্ঞ করে করিয়া প্রয়াস।
রাক্ষস আসিয়া সদা করে যজ্ঞনাশ॥
এই ভার মহারাজ দিলাম তোমারে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেহ যজ্ঞ রাখিবারে॥

দশরথের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হোল।—

রাজা বলিলেন, মুনি করি নিবেদন।
ধনুর্বাণ নাহি জানে কি করিবে রণ॥

অত্যল্প বয়স মম পুত্র চারিগুটি।
শিরে চুল নাহি ঘুচে, আছে পঞ্চঝুঁটি॥
যত সৈন্য চাহ, তাহা লহ, তপোধন।
তাহারা করিবে নিশাচর নিবারণ॥

অতএব, তপোধন, শুন, মম নিবেদন,
আমি যাব সহিত তোমার।
বিনা শ্রীরাম লক্ষ্মণ, আর কিছু প্রয়োজন,
থাকে, চাহ দিব শতবার॥

বিশ্বামিত্র বড় রাগী মুনি, রাজার কথা শুনে রেগে উঠলেন।—

রাজার বচন শুনি কহে কোপে মহামুনি
ঝাট দেহ তোমার কুমার।
আপন মঙ্গল চাহ, শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেহ
নহে বংশ নাশিব তোমার॥

তব বংশে ছিলেন যে হরিশ্চন্দ্র রাজা।
পৃথিবী আমাকে দিয়া করিলেন পূজা॥
তথাপি না পাইলেন মনের সান্ত্বনা।
স্ত্রীপুত্র বেচিয়া শেষে দিলেন দক্ষিণা॥
একা রাম দিতে তুমি করিছ হেলন।
সূর্যবংশ আজি বুঝি হইল নিধন॥

রাজা ভয় পেলেন, ইচ্ছা না থাকলেও রাম-লক্ষ্মণকে সঁপে দিলেন মুনির হাতে।

বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণ এলেন সরযূ নদীর তীরে। বিশ্বামিত্র বললেন।—

এই পুণ্যতীর্থে, রাম, স্নান কর তুমি।
তোমারে সুমন্ত্র দীক্ষা করাইব আমি ॥
শোক, দুঃখ কখন না পাইবা অন্তরে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা না হইবে সহস্র বৎসরে ॥
করিলেন রামচন্দ্র সে মন্ত্র গ্রহণ।
রামেরে কহিতে তাহা শিখিলা লক্ষ্মণ ॥

মন্ত্র শিখে দু'ভাইয়ের দেহের বল অনেক বেড়ে গেল।

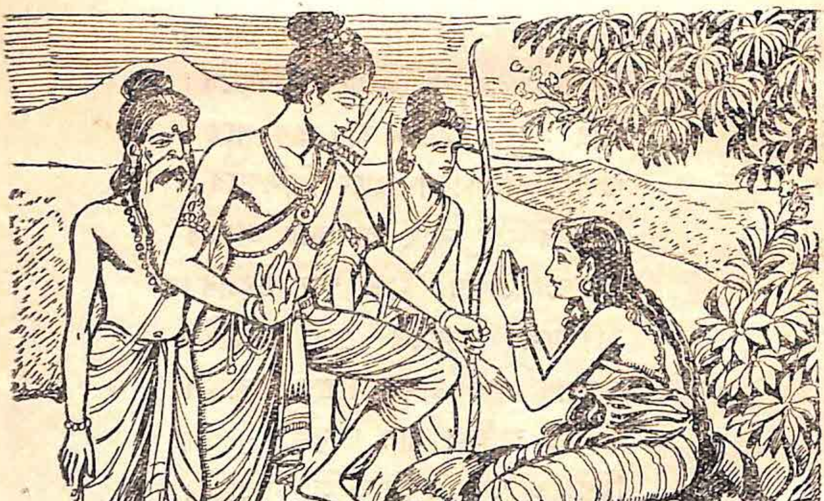
পথ চলতে চলতে তাঁরা এসে পড়লেন এক বনে। সেই বনে তাড়কা নামে এক রাক্ষসী বাস করতো। কত নিরীহ লোককে সে প্রাণে মেরেছে। বনের মধ্যে ঢুকেই রাম ধনুকে টঙ্কার দিলেন।



শুয়েছিল রাক্ষসী সে সুবর্ণের খাটে।
ধনুক-টঙ্কার শুনি চমকিয়া উঠে॥
উঠিয়া চলিল সেই রাম বিদ্যমান।
ডাকিয়া বলিল, আজি লব তোর প্রাণ॥
তাম্রবর্ণ দেখি তার গায় লোমাবলী।
দন্ত গোটা দেখি যেন লোহার শিকলি॥
রামকে খাইতে যায়, ডরে নাহি পারে।
শালগাছ উপাড়িয়া আনিল হুঙ্কারে॥
শাল গাছ উপড়িয়া ঘন দিয়া পাক।
দূর দূর করিয়া তাড়কা দিল ডাক॥
তাহা দেখি রঘুনাথ এড়িলেন বাণ।
বাণাঘাতে করিলেন গাছ খান খান॥
গাছ কাটা দেখিয়া কাঁপিয়া গেল মনে।
শিংশপার গাছ ধরি ঘন-ঘন টানে॥
শিংশপার গাছ তোলে রামে মারিবারে।
তার মুখ ভেদিলেন রাম এক শরে॥
তথাপি তাড়কা যায় রামে গিলিবারে।
মহাবীর তবু নাহি ভয় করে তারে॥
বাণের উপরে বাণ শব্দ ঠন্ঠনি।
বর্ষাকালে বিদ্যুতের যেন ছনছনি॥
বজ্রবাণ এড়ে রাম বজ্রের হুড়ুকে।
নির্ঘাত বাজিল বাণ তাড়কার বুকে॥
বিপরীত ডাক ছাড়ি ত্যজিলেন প্রাণ।
শব্দ শুনি বনবাসী হৈল হতজ্ঞান॥

তারপর রামচন্দ্র গেলেন অহল্যার আশ্রমে। গৌতম মুনির স্ত্রী অহল্যা অভিশাপে পাষাণ হয়েছিলেন, শ্রীরামের স্পর্শে তিনি আবার প্রাণ ফিরে পেলেন।—

ইন্দ্রের কুহকে তাঁর হৈল পাপ-মতি।
অভিশাপে হৈল তাই পাষাণমূরতি॥
তোমার পরশে মুক্তি হইবে তাঁহার।
শাপ-বিমোচন আজ কর অহল্যার॥
শুনিয়া মুনির কথা কমললোচন।
করিলেন পাষানেতে চরণ অর্পণ॥
উঠিলা অহল্যা, হৈল শাপ-বিমোচন।
আহ্লাদিত, দেখিয়া, গৌতম তপোধন॥



এবার বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে আপনার আশ্রমে পৌঁছলেন। মুনিরা যজ্ঞ করতে বসলেন। রাম-লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে যজ্ঞভূমি পাহারা দিতে লাগলেন।—

যজ্ঞের যতেক ধূম উড়য়ে আকাশে।
দেখিয়া রাক্ষসগণ মনে মনে হাসে॥
আমরা জীবন্ত থাকি, মুনি যজ্ঞ করে।
যত আছ নিশাচর, সাজিয়া চলরে॥
এত বলি সসৈন্যে মারীচ নিশাচর।
সাজিয়া আইল শীঘ্র বনের ভিতর॥
দেখিলেন রঘুবীর নিশাচর গণ।
ব্যাপিয়াছে বসুমতী, না যায় গণন॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ তবে ধরি ধনুর্বাণ।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ করেন সন্ধান॥
দুর্জয় রাক্ষস-সেনা রণের ভিতর।
রামের উপরে মারে চোখ-চোখ শর॥
হইলেন জর্জর বাণেতে রঘুবীর।
শোণিত শোভিত হইল শ্যামল শরীর॥
মহাবীর রামচন্দ্র না হন কাতর।
শরবৃষ্টি করেন, যেমন জলধর॥
শ্রীরামের বজ্রবাণ বজ্র যে হুড়ুকে।
নির্ঘাৎ পড়িল দুষ্ট মারীচের বুকে॥
বুকে বাণ বাজিয়া নাটাই হেন ঘুরে।
ডানাভাঙ্গা পাখী যেন ধীরে ধীরে উড়ে॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যায় মারীচ কাতর।
সাত দিনে উত্তরিল লঙ্কার ভিতর॥

রাক্ষসের উৎপাত নিবারিত হোল, মুনিদের যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হোল।

বিশ্বামিত্র বলেন, শুনহ, রঘুবর।
মিথিলাতে হইবে সীতার স্বয়ম্বর॥
করেছে প্রতিজ্ঞা এই জানকীর পিতা।
হরধনু ভাঙ্গিবে যে, তাকে দিবে সীতা॥
কত শত ভূপতি আইসে, আর যায়।
দেখিয়া হরের ধনু হারিয়া পলায়॥
দেখিলাম তোমারে যে বীর বলবান।
মনে বুঝি, ধনুক করিবা দুইখান॥

বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন মিথিলার রাজা জনকের রাজসভায়। বিশ্বামিত্র রাজার কাছে রামের পরিচয় দিলেন। জনক রাজা আনন্দে রামকে নিয়ে গেলেন যেখানে হরধনু আছে সেই স্বয়ম্বর স্থানে। জনক বললেন—

যে জন শিবের ধনু ভাঙ্গিবারে পারে।
সীতা নামে কন্যা আমি সমর্পিব তারে॥

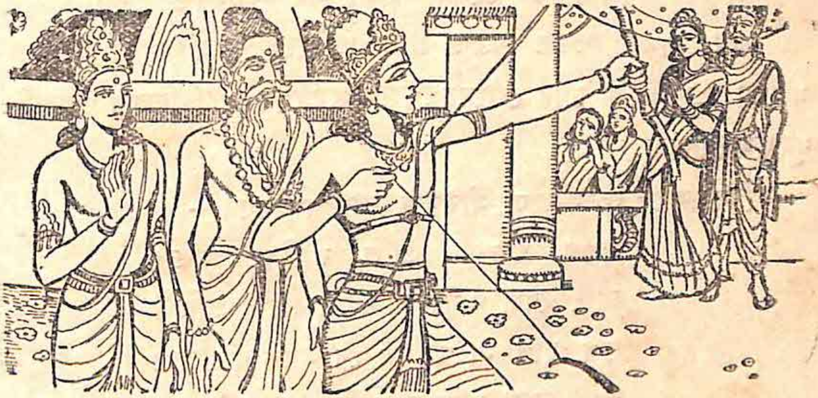
সকলে উৎসুক হয়ে উঠলো রাম কি করেন দেখবার জন্য।—

যত যত রাজা ছিল ভাবিল অন্তরে।
দেখিব কেমনে শিশু ধনুর্ভঙ্গ করে॥
বিস্মিত হইয়া সবে করে নিরীক্ষণ।
ধনুক তোলহ, রাম, বলে সর্বজন॥

মুনি বলিলেন, রাম, দেখাও কৌতুক।
মনোরথ পূর্ণ কর ভাঙ্গিয়া ধনুক॥
আজ্ঞা পেয়ে শ্রীরাম দিলেন গুণে টান।
মড় মড় শব্দে ধনু হৈল দুইখান॥
সভাস্থ সকল লোক হারাইল জ্ঞান।
ত্রিভুবন সঘনে হইল কম্পমান॥
হইলেন জনক-ভূপতি হরষিত।
বাদ্য বাজে মিথিলা নগরে অগণিত॥
মুনি বলিলেন, রাম, এই আমি চাই।
বিবাহ করিয়া ঘরে যাহ দুই ভাই॥

শ্রীরাম বললেন—

চারিভাই জন্ম লইয়াছি একদিনে।
সে সবারে ছাড়ি করি বিবাহ কেমনে?
এ চারি ভ্রাতাকে যেই কন্যা দিবে চারি।
চারি ভাই বিবাহ করিব ঘরে তারি॥



জনক-রাজার পুরোহিত শতানন্দ তখন রাজাকে বললেন—

তোমার কনিষ্ঠ ভাই কুশধ্বজ নাম।
তাঁর দুই কন্যা আছে রূপগুণ-ধাম॥
তোমার দুহিতা দুই পরম সুন্দরী।
চারি ভায়ে সমর্পণ কর কন্যা চারি॥

বিশ্বামিত্র তখন আবার অযোধ্যায় গেলেন, রাজা দশরথকে বললেন—

জনক করিয়াছিল ধনুর্ভঙ্গ পণ।
তাহাতে হারিয়া গেল যত রাজগণ॥
শঙ্করের ধনুক করিয়া দুইখান।
লক্ষ্মীরূপা কন্যা রাম পাইলেক দান॥
চার কন্যা দিবেন জনক চারি ভায়ে।
চল, মহারাজ, শীঘ্র দুই পুত্র লয়ে॥
অযোধ্যাতে তখন পড়িয়া গেল সাড়া।
মিথিলা যাইতে সাজে, রথ, হস্তী, ঘোড়া॥
অগ্রে রথে চলিলেন যতেক ব্রাহ্মণ।
পশ্চাতে চলেন রাজা সহ পুত্রগণ॥

রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন চারি ভাইয়ের সঙ্গে সীতা উর্মিলা মাণ্ডবী শ্রুতকীর্তি চারি বোনের বিবাহ হয়ে গেল। মিথিলায় বিরাট ধুমধাম হোল।

বিদায়কালে জনক-রাজা সীতাকে উপদেশ দিলেন—

শ্বশুর শাশুড়ী প্রতি রাখিহ সুমতি।
রাগ, দ্বেষ, অসূয়া না করো কারো প্রতি॥
সুখ দুঃখ না ভাবিও যে আছে কপালে।
স্বামী সেবা, সতি, না ছাড়িও কোন কালে॥

দশরথ চারি পুত্র ও পুত্রবধূ নিয়ে অযোধ্যায় ফিরলেন। কিন্তু ফেরার পথে ঘটলো এক বিপদ। ক্ষত্রিয় রাজাদের পরম শত্রু পরশুরাম রামের পথ আটকালেন, বললেন—

জীর্ণ ধনু ভাঙ্গিয়া যে দেখাইলা গুণ।
আমার ধনুকে, রাম, দেহ দেখি গুণ॥

পরশুরামের ধনুক নিয়ে শ্রীরাম তাতে শর যোজনা করলেন, তারপর—

শ্রীরাম বলেন, শুন, মুনির নন্দন।
তোমারে না মারি ব্রহ্মবধের কারণ॥
অব্যর্থ আমার বাণ, হইবে কেমন।
স্বর্গ রোধ করি কিম্বা পাতালভুবন॥
যে আজ্ঞা বলিয়া বলে মুনির নন্দন।
চিনিলাম তোমারে যে তুমি নারায়ণ॥
ধর্ম হতে স্বর্গ পায়, নাহি হয় আন।
স্বর্গপথ রুদ্ধ কর, দেব ভগবান॥



ত্যজিলেন শর রাম না করিয়া ক্রোধ।
পরশুরামের করে স্বর্গপথ রোধ॥

পরশুরাম একুশবার পৃথিবী ক্ষত্রিয় শূন্য করেন, সেজন্য মহাবীর বলে তাঁর অহংকার ছিল, এবার সে দর্প চূর্ণ হলো।

শ্রীরামের স্তুতি করি শ্রীপরশুরাম।
তপস্যা করিতে তবে যান নিজধাম॥

তারপর—

চতুর্দোলে শ্রীরাম করিয়া আরোহণ।
অযোধ্যায় দ্রুততর করেন গমন॥
অযোধ্যার যে শোভা তা বলিতে না পারি।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন বাল, বৃদ্ধ, নারী॥
নানা বর্ণ পতাকা উড়িছে নানা স্থলে।
উপরে চাঁদোয়া শোভে গগন মণ্ডলে॥
কুলবধূ আর যত প্রজার কুমারী।
ঘৃতের প্রদীপ দ্বারে জ্বালে সারি সারি॥
সুবর্ণের পূর্ণকুম্ভে দিল আম্রসার।
গুবাক, কদলী, নারিকেল রাখে আর॥
ভরত, শত্রুঘ্ন আর শ্রীরাম, লক্ষ্মণ।
বন্দিলেন গিয়া সবে মায়ের চরণ॥
চারিপুত্র লয়ে রাজা সুখী বহুতর।
সুখে রাজ্য করে, যেন স্বর্গে পুরন্দর॥
কৃত্তিবাস রচে গীত অমৃত সমান।
এতদূরে আদিকাণ্ড হইল সমাধান॥

অযোধ্যাকাণ্ড

রাজা দশরথ বৃদ্ধ হলেন—

বৃদ্ধ রাজা দশরথ, শিরে শুভ্র কেশ।
আসন, বসন শুভ্র, শুভ্র সর্ব বেশ॥

আর রাজ-কাজ ভালো লাগে না, এবার তিনি ধর্মকর্মে মন দেবেন।

রাজা দশরথ কহে, শুন, পাত্রগণ।
রামে রাজা করিব, করহ আয়োজন॥

অযোধ্যায় সাড়া প'ড়ে গেল।—

কেহ নাচে, কেহ গায়, আনন্দ বিশেষ।
রাম রাজা হইলে না রবে কারো ক্লেশ॥
লক্ষ লক্ষ পতাকা উড়িছে নানা রঙ্গে।
রাজগণ আইল কটক সব সঙ্গে॥
নানা রঙ্গে রথ, রথী, হস্তী, ঘোড়া সাজে।
নানা জাতি বাদ্য শুনি, নানাদিকে বাজে॥
আইল দেশের লোক অযোধ্যানগরে।
কেহ নাচে, কেহ গায়, হরষ অন্তরে॥
জয় জয় হুলাহুলি করে বামাগণ।
নৃত্যগীতে আনন্দিত অযোধ্যাভুবন॥

আজ রামের অভিষেক হবে। কিন্তু—

দৈবের নির্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
কে জানে পড়িবে আসি প্রমাদ কখন॥

কৈকেয়ীর এক দাসী ছিল, তার নাম মন্থরা। তার পিঠে এক কুঁজ ছিল, তাই লোকে তাকে বলতো—'কুঁজী'। তার মন ছিল বড় কুটিল। কুঁজী কৈকেয়ীকে বললো—

রাম রাজা হইলে কিসের অধিকার।
ভরত হইলে রাজা সকলি তোমার॥
একেত রাজার তুমি হও মুখ্যরাণী।
ভরত হইলে রাজা রাজার জননী॥
মন্ত্রণা করিয়া রামে পাঠাও কানন।
ভরতেরে রাজ্য দেহ, যদি লয় মন॥

কুঁজীর কু-পরামর্শে কৈকেয়ীর মন বিষিয়ে গেল। কৈকেয়ী বললেন—

ভরত পাইতে রাজ্য না দেখি উপায়।
যুক্তি বল ভরত কিরূপে রাজ্য পায়॥
কি প্রকারে রামের হইবে বনবাস।
ভরতেরে রাজ্য দিয়া পূরাইব আশ॥

কুঁজী বললো—

পূর্ব কথা সকল আমার আছে মনে।
সে সকল কথা কহি, শুন সাবধানে॥
পূর্বে যুদ্ধ করিল যে দানব সম্বর।
সেই যুদ্ধে মহারাজ ক্ষত কলেবর॥
তাহাতে করিলা তুমি তাঁর সেবা, পূজা।
সুস্থ হইয়া বর দিতে চাহিলেন রাজা॥
আরবার রাজার যে হইল বিস্ফোট।
তাপ দিতে মুখের ঠেকিল তাহে ঠোঁট॥

রক্ত, পূয যতেক লাগিল তব মুখে।
তব দুঃখ যত রাজা দেখিল সমুখে॥
তোমার সেবায় রাজা পাইল নিস্তার।
বর দিতে চাহিল তোমায় পুনর্বার॥

সেই বর তো তখন নেওয়া হয়নি, আজ রাজার কাছ থেকে সেই বর নেবার দিন।—

এক বরে করাইবা রাজা ভরতেরে।
আর বরে পাঠাইবা অরণ্যে রামেরে॥

কুঁজীর কথা কৈকেয়ীর মনে লাগলো।

রামের অভিষেকের আয়োজন শেষ করে রাজা গেলেন কৈকেয়ীর ঘরে, দেখেন কৈকেয়ী মেঝের উপর শুয়ে আছেন। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—রাণীর কি হয়েছে ?



কৈকেয়ী বললেন—

দুই বারে দুই বর আছে তব ঠাঁই।
সেই দুই বর রাজা এইক্ষণে চাই॥
এক বরে ভরতেরে দেহ সিংহাসন।
আর বরে শ্রীরামেরে পাঠাও কানন॥
চতুর্দশ বৎসর রাম থাকুক বনে।
ততকাল ভরত বসুক সিংহাসনে॥

কৈকেয়ীর কথা শুনে রাজা মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। জ্ঞান হলে রাজা বললেন—

রাজ্য ছাড়ি যখন শ্রীরাম যাবে বন।
সেই দিনে সেই ক্ষণে আমার মরণ॥
পরমায়ু থাকিতে মজিল মম প্রাণ।
পায়ে পড়ি, কৈকেয়ি, করহ প্রাণদান॥
কৈকেয়ীর পায়ে রাজা লোটে ভূমিতলে।
সর্বাঙ্গ তিতিল তাঁর নয়নের জলে॥

কৈকেয়ী কোন কথা শুনলেন না, বললেন—

সত্য লঙ্ঘে যে, তাহার হয় সর্বনাশ।
যে সত্য পালন করে, স্বর্গে তার বাস॥
পূর্বে সত্য করিলা, আমারে দিবা বর।
এখন কাতর কেন হও, নৃপবর॥

রাজা দশরথ আবার মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। এদিকে অভিষেকের সময় বহে যায়, কৈকেয়ী শ্রীরামকে ডেকে পাঠালেন নিজের ঘরে। রাম আসতেই কৈকেয়ী দশরথের সামনে রামকে বললেন—রাজার কাছে আমার দুটি বর পাওনা ছিল—

দুইবারে দুই বর আছে মম ধার।
মম ধার শুধি তাঁরে সত্যে কর পার॥
এক বরে ভরতে করিব দণ্ডধর।
আর বরে রাম তুমি হও বনচর॥
শিরে জটা ধরি তুমি পরিবা বাকল।
বনে চৌদ্দ বৎসর খাইবা ফুল ফল॥
শুনিয়া কহেন রাম সহাস্য বদনে।
তোমার আজ্ঞায়, মাতা, এই যাই বনে॥

রাম-লক্ষ্মণ গাছের বাকল পরলেন, সীতা পরলেন সাধারণ বেশ। তারপর সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রথে চড়ে তিনজন অযোধ্যা নগরী ত্যাগ করলেন।

দিনের শেষে রথ এসে পৌঁছালো তমসা নদীর তীরে। সেইখানেই রামচন্দ্র রাত কাটালেন।—

হেতা অতিক্রমি নানা নদ, নদী, বন।
গেলেন তমসাকূলে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥



অস্তগিরি গত রবি, বেলার বিরাম।
তমসার জলে স্নান করেন শ্রীরাম॥
লক্ষ্মণ বৃক্ষের তলে বিছাইলা পাতা।
করিলেন তাহাতে শয়ন রাম সীতা॥
হাতে ধনু লক্ষ্মণ রহিলা জাগরনে।
প্রীতি পাইলেন রাম লক্ষ্মণের গুণে॥

পরদিন রাম পৌঁছলেন ভাগীরথীর তীরে। এখানে বন্ধু গুহক চণ্ডালের সঙ্গে দেখা হোল। গুহক রামকে নদী পার ক'রে দিলেন, রাম এলেন ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে। তারপর যমুনা পার হয়ে পৌঁছলেন চিত্রকূট পর্বতে। সেইখানে পর্ণ কুটীর তৈরী করে রামচন্দ্র বাস করতে লাগলেন।

এদিকে পুত্রশোকে রাজা দশরথ আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন—

অন্ধমুনি শাপ তবে ফলে অতঃপরে।
ছট্‌ফট্ করে রাজা, মুখে বাক্য হরে॥
রাম, রাম বলি রাজা ত্যজিল জীবন।
কৌশল্যা ভাবিলা রাজা ঘুমে অচেতন॥
দুই দণ্ড বেলা হয়, সূর্যের উদয়।
তথাপিও নিদ্রা যান রাজা মহাশয়॥
অনন্তর রাজারে করিল মৃতজ্ঞান।
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে, নাহি তার প্রাণ॥

ভরত ও শত্রুঘ্ন এতো ব্যাপার কিছুই জানতেন না, তাঁরা ছিলেন মামার বাড়ী নন্দীগ্রামে।

রাজা স্বর্গগত, রাম গিয়াছেন বনে।
এত ঘোর প্রমাদ ভরত নাহি জানে॥

দূত গিয়ে ভরতকে অযোধ্যায় নিয়ে এলো। ভরত সব শুনলেন। দুঃখে তিনি মূহ্যমান হয়ে পড়লেন। কুলপুরোহিত বশিষ্ট বললেন—

শান্ত হও, ধৈর্য ধর, ত্যজহ ক্রন্দন।
পিতৃঅগ্নিকার্য, শ্রাদ্ধ, করহ তর্পণ॥
পিতৃকার্যে জ্যেষ্ঠ তনয়ের অধিকার।
রাম দেশে নাহি তুমি করহ সৎকার॥

ভরত পিতার অগ্নিকার্য ও শ্রাদ্ধাদি শেষ করলেন, তারপর পাত্র-মিত্রকে বললেন—

রাজ্যের উচিত রাজা রামচন্দ্র ভাই।
রামেরে করিব রাজা, চল তথা যাই॥
রামে রাজা করিয়া পাঠাব নিজ দেশে।
রামের লাগিয়া আমি র'ব বনবাসে॥
আজ্ঞা পেয়ে রথ এবে যোগায় সারথি।
ভরত আনিতে রামে যান শীঘ্রগতি॥
শ্রীরামে আনিতে যায় সকল কটক।
বাল, বৃদ্ধ কেহ কার না মানে আটক॥
চিত্রকূট পর্বতে আছেন রঘুবর।
শুনিয়া ভরত তথা হল অগ্রসর॥
শ্রীরাম, লক্ষ্মণ আর জনকের বালা।
বসতি করেন নির্মাইয়া পর্ণশালা॥
তার দ্বারে বসিয়া আছেন রঘুবীর।
জানকী তাহার মধ্যে, লক্ষ্মণ বাহির॥
হেনকালে ভরত, শত্রুঘ্ন দীনবেশে।
শ্রীরামের আশ্রমেতে যাইয়া প্রবেশে॥

ভরত কহেন, ধরি রামের চরণ।
কার বাক্যে রাজ্য ছাড়ি বনে আগমন॥
অপরাধ ক্ষমা কর, চল, প্রভু, দেশ।
সিংহাসনে বসিয়া ঘুচাও মনঃক্লেশ॥

শ্রীরামচন্দ্র দশরথের মৃত্যু সংবাদ শুনে মূর্ছিত হলেন। তারপর—

ফল্গুর সলিলে স্নান করিয়া তখন।
করিলেন নাম গোত্র লইয়া তর্পণ॥
পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন ফল্গু নদী তীরে।
পিণ্ড সমর্পণ করিলেন নদী নীরে॥

তারপর বললেন—

ভরতে আমাতে নাহি করি অন্য ভাব।
ভরতের রাজত্বে আমার রাজ্যলাভ॥
যাও, ভাই ভরত, ত্বরিত অযোধ্যায়।
মন্ত্রিগণ লয়ে রাজ্য করহ তথায়॥
চতুর্দশ বৎসর, জানহ গত প্রায়।
চারি ভাই একত্র হইব অযোধ্যায়॥

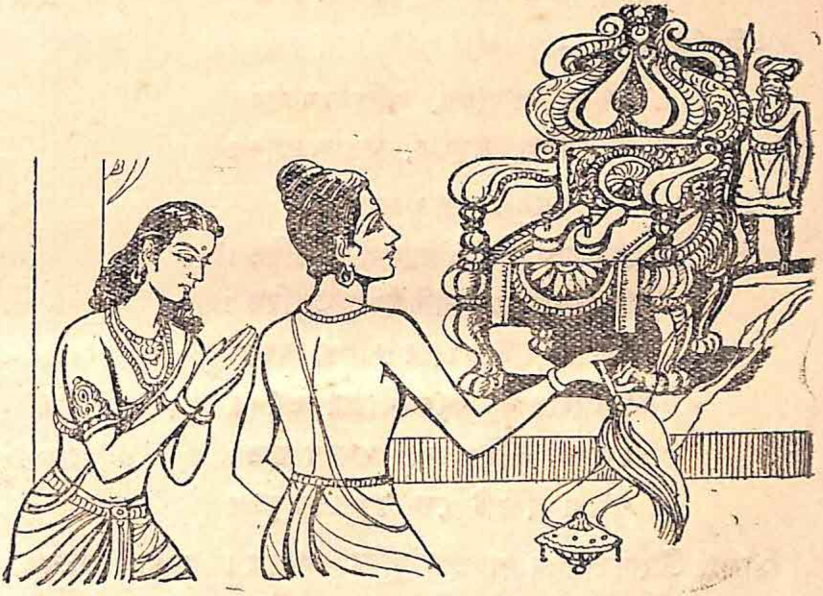
রামচন্দ্র কিছুতেই যখন অযোধ্যায় ফিরতে রাজী হলেন না, তখন ভরত বললেন—

তোমার পাদুকা দেহ করি গিয়া রাজা।
তবে যে পারিব, রাম, পালিবারে প্রজা॥

শ্রীরামের পাদুকা নিয়ে ভরত দেশে ফিরলেন।—

রত্ন সিংহাসনে পট্টের রাম পাতি।
তদুপরি পাদুকা থুইয়া, ধরে ছাতি॥

তার নীচে শ্রীভরত কৃষ্ণসার চর্মে।
পাত্র মিত্র সহিত থাকেন রাজ কর্মে॥
রামসম ভরতের শিরে জটাভার।
তেমতি বল্কল বাস, ফল-মূলাহার॥
রাজভোগ সুখসাধ ঠেলিয়া চরণে।
ভরত সন্ন্যাসী হল নবীন যৌবনে॥



অরণ্যকাণ্ড

রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করলেন।—

বহুপথ, তিনজন করি অতিক্রম।
সম্মুখে দেখেন অত্রিমুনির আশ্রম॥

অত্রিমুনি বললেন—

সম্মুখে দণ্ডকারণ্য, অতি রম্যস্থান।
তথা গিয়া, রঘুবীর, কর অবস্থান॥

তিন জনে দণ্ডক কাননে প্রবেশ করলেন।

হেনকালে, বিরাট রাক্ষস আচম্বিত।
বিকট আকারে আসি হৈল উপস্থিত॥
সীতারে খাইতে চাহে মেলিয়া বদন।
শ্রীরামেরে কটু কহে করিয়া তর্জন॥
ছাড়েন ঐষিক বাণ দশরথ সুত।
পড়িল বিরাট যেন কৃতান্তের দূত॥

তারপর শ্রীরাম গেলেন শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে। সেখান থেকে গেলেন অগস্ত্যমুনির আশ্রমে। অগস্ত্য বললেন—

গদাবরী তীরে, রাম, দিব্য আয়তন।
পঞ্চবটী গিয়া তথা থাক তিনজন॥

পঞ্চবটী বনে তিনজনের দিন সুখেই কাটছিল। সহসা একদিন—

রাবণের ভগ্নী এক, নাম শূর্পনখা।
অকস্মাৎ রামের সম্মুখে দিল দেখা॥

শূর্পনখা প্রথমে রামচন্দ্র তারপর লক্ষ্মণকে বিবাহ করতে চাইল। রাম লক্ষ্মণ তার কথা তো হেসেই উড়িয়ে দিলেন। শূর্পনখা তখন সীতাকে গিলে খেতে গেল।—

বদন মেলিয়া যায় সীতা গিলিবারে।
ত্রাসেতে বিকলা সীতা রাক্ষসীর ডরে॥
হেরিয়া লক্ষ্মণ ক্রোধে মারিলেক বাণ।
এক বাণে তাহার কাটিল নাক, কান॥
নাক, কান গেল কাটা, রক্ত পড়ে স্রোতে।
ওষ্ঠাধর রাক্ষসীর ভিজিল শোণিতে॥

শূর্পনখার দুই মাসতুতো ভাই, খর ও দূষণ সেই বনে বাস করতো—

শূর্পনখা যা'য় খর দূষণের পাশে।
নাকে হাত দিয়া কান্দে, গাত্র রক্তে ভাসে॥
খর বলে, দেখ তুমি আমার প্রতাপ।
ঘুচাইব এখনি তোমার মনস্তাপ॥

চৌদ্দ হাজার রাক্ষস নিয়ে তারা শ্রীরামচন্দ্রকে আক্রমণ করলো। সীতাকে লক্ষ্মণের কাছে রেখে রাম একাই লড়লেন।—



রাম আর খর ক্রোধে অগ্নির আকার।
দশ দিক করেন বাণেতে অন্ধকার॥

যুদ্ধে এঁটে উঠতে না পেরে খর শেষে—

রামেরে কামড় দিতে হয় আগুয়ান।
শ্রীরাম ঐষিক বাণ করেন সন্ধান॥
বজ্রাঘাতে যেমন পর্বত দুই চির।
গায়ে প্রবেশিতে বাণ পড়ে খর বীর॥
চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস পড়ে রণে।
শ্রীরামেরে বাখানে আসিয়া দেবগণে॥
রামের বিক্রম যত শূর্পনখা দেখে।
শঙ্কাকুলা লঙ্কায় চলিল মনোদুঃখে॥

লঙ্কার রাজা রাবণ। সেখানে গিয়ে শূর্পনখা বললো—

রামের মহিষী সীতা সাক্ষাৎ পদ্মিনী।
ত্রৈলোক্য মোহিনী রূপে, অতুলা কামিনী॥
সীতার রূপের সমা আর নাই নারী।
উর্বশী, মেনকা, রম্ভা হারে রূপে তারি।
যেমন মহৎ তুমি পুরুষ সমাজে।
সীতা নারী, তেমন, তোমাতে মাত্র সাজে॥
চাহিলাম সীতা তোমা দিতে উপহার।
সেই দোষে নাক, কান কাটিল আমার॥
মানুষ হইয়া বেটা এত স্পর্ধা ধরে।
ত্রিভুবনে আর কেবা গণিবে তোমারে॥
আপনার দোষ কিছু না বলে পাপিনী।
রাবণ ভাবিল মোর ভগ্নী হিতৈষিনী॥

রাবণ মস্ত বড় রাজা, দেবতারা তার ভয়ে কাঁপে, বোনের এই অপমান সে সইতে পারলো না। পুষ্পক রথে চড়ে রাবণ পঞ্চবটী যাত্রা করলো। পুষ্পক রথ আকাশ-পথে চলে।—

সেই রথে আরোহণ করে লঙ্কেশ্বর।
বিদ্যুতের প্রায় রথ চলিল সত্বর॥

রাবণ এলো মারীচের আশ্রমে। মারীচ মায়া-বিদ্যা জানতো।—

রাজা বলে, মারীচ, হরিণ হও তুমি।
ভাণ্ডাইয়া রামেরে হরিব সীতা আমি॥

মারীচ প্রথমে রাজী হোল না। রাবণকে সে অনেক বুঝালো, কিন্তু রাবণ কোন কথাই শুনলো না, বললো—

নিষেধ করেন যদি দেব পঞ্চানন।
তথাপি আনিব সীতা, না যায় খণ্ডন॥
উপদেশ দিতে চাহ, নাহি শুন কথা।
এই খড়গাঘাতে কাটিব তোর মাথা॥

অগত্যা প্রাণের দায়ে মারীচ সোনার হরিণের রূপ ধরলো।

বন মধ্যে লুকাইয়া রহিল রাবণ।
আলো করি মায়ামৃগ করিল গমন॥
রাম সীতা বসিয়া আছেন যেই স্থানে।
মৃগ গিয়া দরশন দিল সেইখানে॥

সীতা হরিণ দেখে মুগ্ধ হলেন, রামচন্দ্রকে বললেন হরিণটিকে ধরে দেবার জন্য।

শ্রীরাম করেন সজ্জা, হাতে ধনুঃশর।
যান মৃগ মারিতে লক্ষ্মণে রাখি ঘর॥

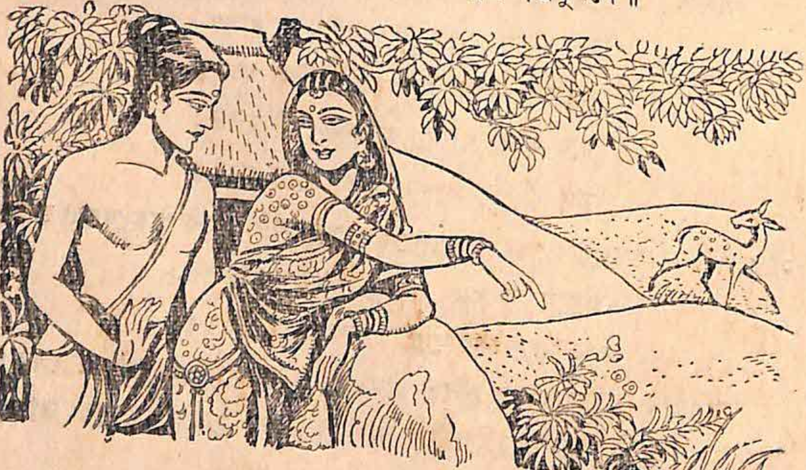
হরিণের পিছনে ছুটতে ছুটতে রামচন্দ্র গভীর বনে প্রবেশ করলেন। অনেক ছুটাছুটি করেও হরিণটিকে ধরা যায় না দেখে, শেষে তাকে

বাণ বিদ্ধ করলেন। মৃত্যুকালে সহসা মারীচ রামের কণ্ঠস্বর নকল করে চীৎকার করে উঠলো--

আইস, লক্ষ্মণ, ঝাট, কর পরিত্রাণ।
রাক্ষস মেলিয়া, ভাই, লয় মোর প্রাণ॥
হেথা শুনিলেন সীতা করুণ বচন।
বলিলেন, ঝাট যাও, দেবর লক্ষ্মণ॥
আর্তস্বরে শ্রীরাম যে ডাকেন তোমারে।
দেখ গিয়া, তাঁহারে কি রাক্ষসেতে মারে॥
লক্ষ্মণ বলেন, নাই শ্রীরামের ভয়।
মৃগ মারি আসিবেন, কিসের বিস্ময়॥
এত ব্যস্ত হও, দেবি, কিসের কারণ।
রামেরে মারিতে পারে আছে কোন্‌জন॥

সীতা কিন্তু সেকথা শুনলেন না, বললেন—

ভ্রাতার বিপদ শুনি স্থির আছ মনে।
কাপুরুষ তব সম নাহি ত্রিভুবনে॥



লক্ষ্মণ তখন আর কি করেন, সীতাকে ঘরে রেখে রামের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন।

এতক্ষণে রাবণের সিদ্ধ অভিলাষ।
তপস্বীর বেশ ধরি যায় সীতা-পাশ ॥

রাবণ ভিক্ষা চাইলেন।—

ফল হাতে হইলেন বাহির জানকী।
লইতে আইল দুষ্ট রাবণ পাতকী ॥
ধরিয়া সীতার হাত লইল ত্বরিত।
জানকী বলেন, হায়! একি বিপরীত ॥

রাবণ সীতাকে জোর করে রথে তুলে নিয়ে আকাশ পথে উড়লো।—

অত্যন্ত কাতর সীতা করেন রোদন।
এমন সময় রক্ষা করে কোন জন ॥
জটায়ু নামেতে পক্ষী গরুড় নন্দন।
দূর হৈতে শুনিল সে সীতার ক্রন্দন ॥
আকাশে উঠিয়া পক্ষী চতুর্দিকে চায়।
দেখিল রাবণ রাজা সীতা লয়ে যায় ॥
ছিঁড়িল ঠোঁটের ঘায় সারথির মুণ্ড।
রথধ্বজে ভাঙ্গিয়া করিল খণ্ড, খণ্ড ॥
রাবণের মুকুট সে রত্নেতে নির্মান।
ঠোঁট দিয়া পক্ষী তারে করে খান খান ॥

কিন্তু জটায়ু পারলো না, রাবণ তার ডানা দু'খানি কেটে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর আবার রথ চললো বায়ু বেগে।—

রামে জানাইতে সীতা ফেলেন ভূষণ।
সীতার ভূষণ-পুষ্পে ছাইল গগন ॥

আভরণ গলার ফেলেন সীতা দেবী।
সে ভূষণে সুশোভিতা হইল পৃথিবী॥

রাবণ লঙ্কায় পৌঁছালো।—

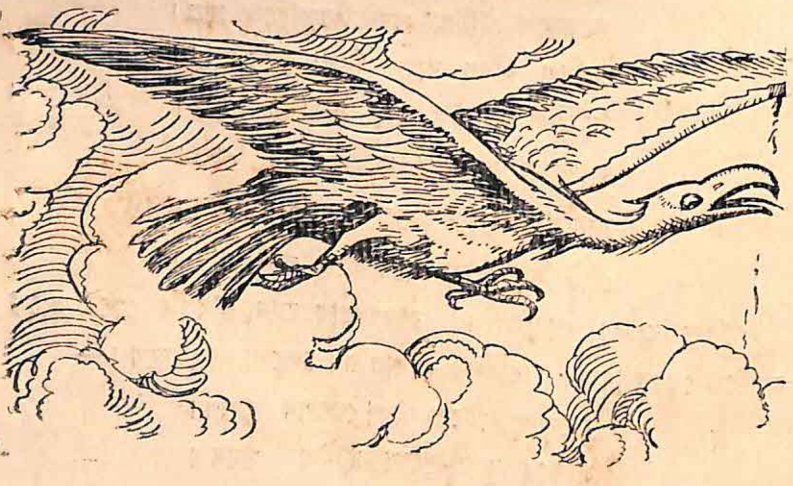
সীতারে রাখিল লয়ে অশোক-কাননে।
সীতারে বেড়িল গিয়া যত চেড়ীগণে॥

এদিকে রাম লক্ষ্মণ তো ঘরে ফিরলেন।

উপনীত হইলেন কুটীরের দ্বারে॥
সীতা, সীতা বলিয়া ডাকেন বারে, বারে॥
শূন্য ঘর দেখেন, না দেখেন জানকী।
মূর্ছাপন্ন, অবসন্ন শ্রীরাম-ধানুকী॥

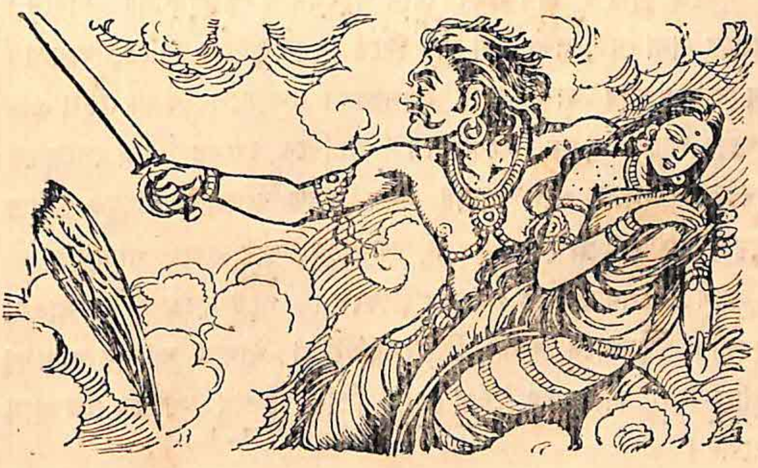
দু'ভাই সীতাকে পাতি পাতি করে খুঁজে দেখলেন ;—

প্রতি বন, প্রতি স্থান, প্রতি তরুমূল।
দেখেন সর্বত্র রাম হইয়া ব্যাকুল॥



পাতি, পাতি করিয়া চাহেন দুই বীর।
উলটি, পালটি যত গোদাবরী তীর॥
গিরিগুহা দেখেন, মুনির তপোবন।
নানা স্থানে সীতারে করেন অন্বেষণ॥
একবার যেখানে করেন অন্বেষণ।
পুনর্বার যান তথা সীতার কারণ॥
এইরূপে একস্থানে যান শতবার।
তথাপি না পান দেখা শ্রীরাম সীতার॥
বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।
ভুলিতে না পারি সীতা, সদা মনে জাগে॥
কি করিব,কোথা যাব, অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব, কর নিরূপণ॥

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বনের মধ্যে সীতার খোঁজ করতে করতে জটায়ুকে দেখতে পেলেন।—



এইরূপে শ্রীরাম ভ্রমেন চারিদিকে।
রক্তে রাঙ্গা জটায়ুকে দেখেন সম্মুখে॥
কাতর জটায়ু অতি হেরি রঘুবীরে।
মুখে রক্ত উঠে, বীর বলে ধীরে ধীরে॥
অন্বেষিয়া সীতারে পাইলে বহু ক্লেশ।
কিন্তু হেথা সীতার না পাইবে উদ্দেশ॥
দুই ভাই তোমরা না ছিলা যবে ঘর।
শূন্য ঘর পাইয়া হরিল লঙ্কেশ্বর॥
আমি বৃদ্ধ, যুদ্ধ করি, রুদ্ধ করি তায়।
রাখিয়া ছিলাম, রাম, তোমার আশায়॥
দুই পাখা কাটিলেক পাপিষ্ঠ রাবণ।
মুখে রক্ত উঠে, রাম, যায় এ জীবন॥

এই সংবাদটুকু দেবার জন্যই বুঝি জটায়ু বেঁচে ছিল, এবার দেহত্যাগ করলো।

ঘুরতে ঘুরতে রাম লক্ষ্মণ এসে পড়লেন কবন্ধ রাক্ষসের সামনে। কবন্ধের মাথা নেই, লম্বা লম্বা হাত দিয়ে সে দু'ভাইকে আঁকড়ে ধরলো। রাম লক্ষ্মণ তার হাত কেটে ফেললেন। আসলে কবন্ধ ছিল এক দেবতা, শাপে রাক্ষস হয়েছিল। এতদিনে রামের দেখা পেয়ে সে শাপমুক্ত হোল। স্বর্গে যাবার সময় কবন্ধ বললো—ঋষ্যমুক পর্বতে গিয়ে সুগ্রীবের সঙ্গে দেখা করগে, সীতাকে উদ্ধার করতে পারবে।

রাম চললেন ঋষ্যমুক পর্বতের উদ্দেশে। পথে মতঙ্গ মুনির আশ্রম পড়লো। সেখানে শবরী শ্রীরামের দেখা পাবার আশায় অপেক্ষা করছিলেন। রামচন্দ্রের দেখা পেয়ে তিনি চিতার আগুনে দেহত্যাগ করলেন।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

রাম লক্ষ্মণ এলেন ঋষ্যমুক পর্বতে।

সুগ্রীব পাহাড়ের উপর থেকে দেখতে পেয়ে হনুমানকে পাঠালেন—তাঁরা কে খবর নেবার জন্য। হনুমান এসে রামকে বললেন—

সুগ্রীব বানর রাজা লোকে খ্যাতিমান।
তাঁহার সচিব আমি নাম হনুমান॥

রামচন্দ্র বললেন—

ভ্রমিতেছি মোরা রাজা সুগ্রীব উদ্দেশে।
দোঁহারে লইয়া চল সুগ্রীবের পাশে॥

হনুমান দু'জনকে সুগ্রীবের কাছে নিয়ে গেলেন। অগ্নিসাক্ষী করে রামের সঙ্গে সুগ্রীবের বন্ধুত্ব হোল—

পরস্পর বৈরি মারি উদ্ধারিব নারী।
অগ্নি সাক্ষী, এই সত্য হইল দোঁহারি॥



সুগ্রীব বললেন—

আমরা বানর পঞ্চ ছিলাম পর্বতে।
দেখিলাম এক কন্যা রাবণের রথে॥
হাত, পা আছাড়ে, করে কঙ্কনের ধ্বনি।
গরুড়ের মুখে যেন বদ্ধ ভুজঙ্গিনী॥
গলার উত্তরী, শরীরের আভরণ।
রথ হৈতে পড়িল যেমন তারাগণ॥
অনুমানে বুঝি তিনি তোমার সুন্দরী।
যত্ন করি রাখিয়াছি ভূষণ, উত্তরী॥

সীতার বসন ভূষণ সুগ্রীব রামচন্দ্রকে দেখালেন, রামচন্দ্র দেখেই চিনলেন। সুগ্রীব বললেন—

মিথ্যা না বলিব, মিত্র অগ্নি সাক্ষী করি।
উদ্ধার করিব আমি তোমার সুন্দরী॥

তারপর সুগ্রীব বললেন নিজের দুঃখের কথা। বালী তার বড় ভাই। দুন্দুভি নামে এক দানবের সঙ্গে লড়াই করতে সে একবার পাতালে যায়। পাতালে যাবার সুড়ঙ্গের মুখে সুগ্রীবকে রেখে যায় পাহারায়। এক বছর কেটে গেল তবু বালী ফিরলো না দেখে সুগ্রীব ভাবলো বালী মারা গেছে, সুড়ঙ্গের মুখে একখানি পাথর চাপা দিয়ে সে রাজ্যে ফিরে এলো। তখন মন্ত্রীরা সুগ্রীবকেই রাজা করলো। এদিকে পুরো একটি বছর লড়াই করে দুন্দুভিকে বধ করে বালী যখন পাতাল থেকে ফিরলো তখন গুহা থেকে আর বেরুতে পারে না, গুহার মুখে প্রকাণ্ড একখানি পাথর চাপা দেওয়া আছে। কোন রকমে সেই পাথর সরিয়ে বালী তো বাহির হোল, রাজ্যে ফিরে এসে দেখে সুগ্রীব রাজা হয়ে বসেছে। সুগ্রীবকে তখনই সে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিল।

সুগ্রীব ঋষ্যমুক পর্বতে আছে সেই থেকে। এখানে বালী আসতে পারে না, মাতঙ্গ মুনির শাপ আছে এখানে বালী এলেই পাষাণ হয়ে যাবে।

হেথায় না আসে বালী, আছে শাপ ভয়।
তাই হেথা, রঘুনাথ, লয়েছি আশ্রয়॥
নতুবা নিশ্চিত মোর বধিত পরান।
বালী হতে মোরে, মিত্র, কর পরিত্রাণ॥

রাম সুগ্রীবের সঙ্গে চললেন বালীর কাছে। সুগ্রীবকে দেখেই বালী তার উপর ঝাপিয়ে পড়লো, ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই সুরু হোল।—

দুই সিংহ যুঝে যেন, ছাড়ে সিংহনাদ।
দুই ভাই যুদ্ধ করে নাহি অবসাদ॥
দেখেন শ্রীরাম বাণ করিয়া সন্ধান।
উভয়ের বেশভূষা বয়স সমান॥
চিনিতে না পারেন রাম সুগ্রীব বালীরে।
ভাবেন, মারিতে শত্রু পাছে মিত্র মরে॥

বালীকে আর বাণ মারা হোল না! বালীর হাতে সুগ্রীব খুব মার খেল।—

রক্তে রাঙ্গা, অঙ্গ ভাঙ্গা, পলায় সুগ্রীব।
আগে যায়, ফিরে চায়, প্রায় সে নির্জীব॥

সুগ্রীব প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলো। রামচন্দ্র তাকে তাঁর অসুবিধার কথা বললেন।—

চিহ্ন বিনা চিনা নাহি যায় সুগ্রীবেরে।
চিহ্ন দিতে শ্রীরাম কহেন লক্ষ্মণেরে॥

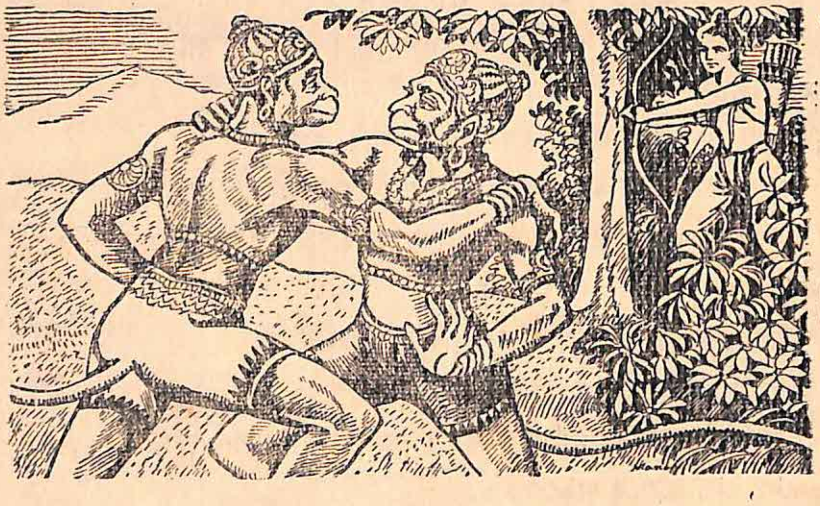
লক্ষ্মণ সুগ্রীবের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন, সুগ্রীব আবার চললো বালীর সঙ্গে লড়তে।

বালীর রাণী তারা খুব বুদ্ধিমতী, সে বালীকে বললো—

মন্দ হ'ক সুগ্রীব, তথাপি সহোদর।
সহোদর সঙ্গে, প্রভু, অযোগ্য সমর॥
পাত্রগণ রাজ্য দিল করিয়া সন্তোষ।
সুগ্রীব হইল রাজা, তার নাহি দোষ॥

কিন্তু বালী সে কথা শুন্‌লো না, বাহির হয়ে এলো সুগ্রীবের সঙ্গে লড়াই করতে।—

বজ্রসম মুষ্টি বালী মারে তার বুকে।
অচেতন সুগ্রীব, শোণিত উঠে মুখে॥
সুগ্রীবেরে অচেতন দেখিয়া সম্মুখে।
শ্রীরাম ঐষিক বাণ যুড়েন ধনুকে॥
দশদিক আলো করি বাণ গোটা ছুটে।
বজ্রাঘাত সম সে বালীর বুকে ফুটে॥



রামচন্দ্র গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন, এবার বাহির হয়ে এলেন, বালী বললো—

কোথাও না দেখি হেন, কখন না শুনি।
অন্যের সহিত যুদ্ধে অন্যে হয় হানি॥
কেমনে দেখাবে মুখ সাধুর সমাজে।
বিনা দোষে, কপটে, বধিয়া বালিরাজে॥
যদ্যপি আমারে, রাম, দিতে এই ভার।
একদিনে করিতাম সীতার উদ্ধার॥
আনিতাম রাবণেরে ধরিয়া গলায়।
সেবক হইয়া, রাম, সেবিত তোমায়॥

রাম বললেন—

করিয়াছি মিত্রতা পাবক সাক্ষী করি।
কোথাও না রাখি আমি সুগ্রীবের অরি॥
করিলে সুগ্রীব প্রতি বহু অত্যাচার।
সেই পাপে হৈল, বীর, মরণ তোমার॥

বালী মারা গেল। তারা স্বামীর শোকে কাতর হয়ে রামচন্দ্রকে অভিশাপ দিল—

সীতা উদ্ধারিবে, রাম, আপন বিক্রমে।
সীতারে আনিবে ঘরে বহু পরিশ্রমে॥
কিন্তু সীতা না রহিবে সদা তব পাশ।
কিছু দিন থাকিয়া করিবে স্বর্গবাস॥
আমি যদি সতী হই ভারত ভিতরে।
কান্দিবে সীতার হেতু, কে খণ্ডিতে পারে॥

তারপর— শুভক্ষণে সুগ্রীব বসিল সিংহাসনে।
চারিভিতে চামর ঢুলায় কপিগণে॥
করিল অঙ্গদে যুবরাজ পাত্রগণ।
রাম জয় বলি ডাকে সব কপিগণ॥

তখন বর্ষাকাল, যুদ্ধের আয়োজন করা চলে না। রামচন্দ্র বনবাসেই দিন কাটাতে লাগলেন।

বর্ষাকাল শেষ হতেই সুগ্রীব দিকে দিকে দূত পাঠালেন, কোথায় সীতা আছে সন্ধান নেবার জন্য। পূর্বদিকে পাঠালেন বিনোদকে, দক্ষিণ দিকে পাঠালেন হনুমানকে, শতবলীকে পাঠালেন উত্তর দেশে, অন্য সেনাপতিকে পাঠালেন পশ্চিমদেশে, বলে দিলেন—

মাসেকের মধ্যেতে আসিবে, বীরগণ।
অধিক হইলে তার অবশ্য মরণ।

দেখতে দেখতে একমাস শেষ হয়ে এলো।

পশ্চিম, উত্তর, পূর্ব, তিন দিক হতে।
আসিয়া বানর কহে সবার সাক্ষাতে॥
নানা গিরি চাহিনু, খুঁজিনু বহু দেশ।
কোন স্থানে না পাইনু সীতার উদ্দেশ॥

দক্ষিণ দিকে গিয়েছিল অঙ্গদ, জাম্ববান ও হনুমান, তারা ঘুরতে ঘুরতে সমুদ্রতীরে এসে পড়লো এক গহ্বরে। সেখানে ময়দানবের বাড়ী। সে পাতালপুরী থেকে বেরিয়ে আসা সহজ নয়। সম্ভবা নামে এক তাপসীর দয়ায় তারা সেখান থেকে বেরিয়ে এলো। সমুদ্র দেখিয়ে সম্ভবা বললেন—

যদি পার এ সাগর হইবারে পার।
তবে সে হইবে বটে সীতার উদ্ধার॥

সুন্দরাকাণ্ড

বানরেরা সাগর দেখে ভয় পেল।—

সাগর দেখিয়া সবে পাইল তরাস।
সবারে অঙ্গদবীর করেন আশ্বাস॥

কিন্তু এই সাগর পার হয়ে লঙ্কায় যাবে কে ?—

হনুমান কহিলেন, না করিব ভয়।
লঙ্ঘিব সাগর আমি কহিনু নিশ্চয়॥
উড়িয়া পড়িব গিয়া স্বর্ণলঙ্কাপুরী।
শত্রু মারি উদ্ধারিব রামের সুন্দরী॥

এই কথা বলে হনুমান মহেন্দ্র পর্বতে গিয়ে উঠলেন।

গিরিশিরে উঠি বীর ছাড়েন লম্ফন।
পদভরে বসুমতী কাঁপে ঘন ঘন॥

কিন্তু আকাশপথে পথ আটকে দাঁড়ালো সুরমা নাগিনী। প্রকাণ্ড তার হাঁ। হনুমান তার মুখের মধ্যে ঢুকে কান দিয়ে বাহির হয়ে

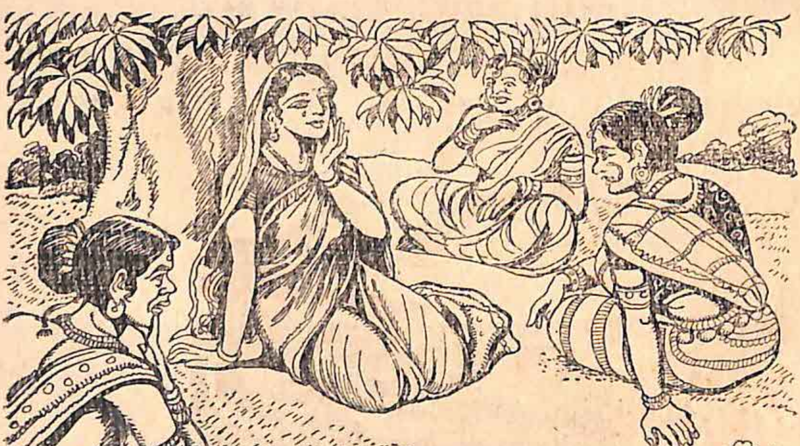


গেলেন। তারপর দেখা দিল সিংহিকা রাক্ষসী, হনুমান তার পেটের ভিতরে ঢুকে তার নাড়ি-ভুঁড়ি ছিঁড়ে, তাকে মেরে ফেললো। তারপর হনুমান এসে পৌঁছালো লঙ্কাপুরীতে।

কাঞ্চন, রজত, মণি, স্ফটিকে নির্মাণ।
পুরী শোভা দেখিয়া বিস্মিত হনুমান॥

চারিদিকে সীতার খোঁজ করতে করতে হনুমান এলো অশোক বনে। এক শিশুগাছের উপর থেকে হনুমান দেখতে পেলে এক গাছ তলায় সীতা বসে আছেন; আর রাবণের চেড়ীরা তাঁকে পাহারা দিচ্ছে।—

চেড়ী সব দেখে তথা অতি ভয়ঙ্কর।
পর্বত প্রমাণ হাতে লোহার মুদ্গর॥
কেহ কালী, কেহ গৌরী, কেহ চেড়ী ধল।
খর্জুর তালের মত দেখি কেশাবল॥



হাতে মুখে সর্বাঙ্গে রক্তের ছড়াছড়ি।
ভয়ঙ্কর মূর্তি সব রাবণের চেড়ী॥
নানা অস্ত্র ধরিয়াছে, খাণ্ডা ঝিকিমিকি।
চেড়ী সব ঘেরিয়াছে সুন্দরী জানকী॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
দৃষ্টিমাত্র চিনিলেন পবন নন্দন॥

গভীর রাত্রে চেড়ীরা ঘুমিয়ে পড়লে হনুমান গাছ থেকে নেমে সীতার কাছে গেলেন, বললেন।—

রাবণের চর বলি না করিহ ভয়।
স্বরূপে রামের দূত জানিহ নিশ্চয়॥
আমার বচনে যদি না হয় প্রত্যয়।
রামের অঙ্গুরী দেখ, বুঝিবে নিশ্চয়॥

কিষ্কিন্ধ্যা থেকে আসার সময় রামচন্দ্র হনুমানকে নিজের আংটিটি দিয়েছিলেন। সেই আংটি দেখে সীতার আর কোন সন্দেহ রইল না।

জানকী বলেন, শুন পবনকুমার।
বিনা যুদ্ধে বাছা, মোর নাহিক উদ্ধার॥
সুগ্রীবে জানাইও আমার কাকুতি।
আর যত আছে তাঁর সৈন্য সেনাপতি॥
দুইমাস রাবণ দিয়াছে প্রাণদান।
অতঃপর কাটিয়া করিবে খান, খান॥
আমি মৈলে সবাকার বৃথা আয়োজন।
যদি ঝাট আইস, তবে রহিবে জীবন॥

হনুমান তখন বললেন—

নিদর্শন দেহ কিছু, যাইব ত্বরিতে।
মাসেকের মধ্যে ঠাট আনিব লঙ্কাতে॥

সীতা মাথার মণি খুলে হনুমানের হাতে দিলেন।

মণি লয়ে হনুমান ভাবে মনে মনে।
আপন বিক্রম কিছু দেখাই রাবণে॥

হনুমান অমৃত-বনে প্রবেশ করলো—

ফল, ফুল খায় বীর, ছিঁড়ে আর পাতা।
উপাড়িয়া ফেলে গাছ, ভাঙে বৃক্ষ, লতা॥
দশ বিশ চেড়ী ধরি মারয়ে আছাড়।
ভাঙ্গিয়া মাথার খুলি চূর্ণ করে হাড়॥
অক্ষয় নামেতে ছিল রাবণ তনয়।
হনুমান পাঠাইল তারে যমালয়॥
শুনিয়া দূতের মুখে পুত্রের মরণ।
ইন্দ্রজিতে পাঠাইল কোপে দশানন॥
মহাবীর ইন্দ্রজিত জানে নানা সন্ধি।
পাশ অস্ত্রে হনুমানে করিলেক বন্দী॥

হনুমানকে বেঁধে নিয়ে এলো রাবণ রাজার কাছে।

অগ্নিতে পোড়ায়ে তারে বধিবার তরে।
আজ্ঞা দিল দশানন যত অনুচরে॥

রাক্ষসেরা মজা দেখবার জন্য হনুমানের লেজে যত রাজ্যের ন্যাকড়া জড়িয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। হনুমান সেই জ্বলন্ত লেজ নিয়ে লঙ্কার ঘরে ঘরে লাফিয়ে বেড়াতে লাগলো, বাড়ী-বাড়ী আগুন ধরে গেল।—

রত্নেতে নির্মিত ঘর অতি মনোহর।
লেখা, জোখা নাই যত পোড়ে রাজঘর॥
পর্বত প্রমাণ অগ্নি চতুর্দিকে বেড়ে।
হস্তী, অশ্ব, পোষা পক্ষী তাহে কত পোড়ে॥
স্বর্ণময় লঙ্কাপুরী ভগ্নশেষ হইল।
রাজঘর, পাত্রঘর কিছু না রহিল॥
সব লঙ্কা হনুমান কৈল ছারখার।
লঙ্কার সকল প্রাণী করে হাহাকার॥
দগ্ধ করি লঙ্কাপুরী বীর হনুমান।
শ্রীরামের বার্তা দিতে করেন প্রয়াণ॥

হনুমান সাগর লঙ্ঘন করে ফিরে এলো।

এবার হনুমান কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরলো। হনুমানের মুখে সীতার খবর শুনে রামচন্দ্র আশ্বস্ত হলেন।

শ্রীরাম বলেন, ধন্য ধন্য হনুমান।
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান॥



বানর সেনা নিয়ে শ্রীরামচন্দ্র বাহির হয়ে পড়লেন সীতা উদ্ধারে।

পবন পুত্রের কথা শুনি হরষিত।
শুভযাত্রা করিলেন শ্রীরাম ত্বরিত॥
সঙ্গে চলে কপি-ঠাট, নাহি দিশপাশ।
কটক যুড়িয়া যায় মেদিনী, আকাশ॥
কিলি, কিলা শব্দ করি কপিগণ চলে।
উত্তরিল গিয়া সবে আসরের কূলে॥

রাবণ চরের মুখে সব খবর পেলেন।

রাবণ সভায় পরামর্শ করতে বসলেন। রাবণের ছোট ভাই বিভীষণ ধার্মিক মানুষ, তিনি বললেন—সীতাকে চুরী করে আনা ভাল কাজ হয়নি, সীতাকে ফিরিয়ে দিন।—

কোন্ কার্যে মজাইতে চাহ লঙ্কাপুরী।
পাঠাইয়া দেহ শীঘ্র রামের সুন্দরী॥
এ হেন সুন্দর রাজ্য, এ হেন সম্পদ।
নিজ দোষে কেন, ভাই, ঘটাও বিপদ॥

রাবণ বিভীষণের কথা শুনলো না।—

ক্রোধ ভরে দশানন মহাবেগে চলে।
পদাঘাত কৈল বিভীষণ বক্ষস্থলে॥
বিভীষণ অচেতন হইয়া তাহায়।
পড়িল ধরণীতলে ছিন্ন তরু প্রায়॥

বিভীষণ জ্ঞান ফিরে পেয়ে রাবণের সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন, বরাবর চলে এলেন রামের কাছে, বললেন—

রাবণের ভাই আমি, নাম বিভীষণ।
তোমার চরণে আজি লইনু শরণ॥

সাগর পার হয়ে শ্রীরাম লঙ্কায় যাবার উদ্যোগ করলেন। সাগর পার হবার আয়োজন হোল।—

রামচন্দ্র অগ্নিবাণ মেরে সাগরের জল শুকিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন। সাগর দেবতা ভয় পেলেন, রামকে দেখা দিয়ে বললেন—বিশ্বকর্মার ছেলে নল জানে সাগরের জলে পাথর ভাসাতে, সে স্পর্শ করিলেই পাথর ভাসবে। জলে পাথর ভাসিয়ে তুমি লঙ্কা অবধি সেতু তৈরী করে ফেল। সেই সেতু দিয়ে তুমি সাগর পার হয়ে যাও।

বানরেরা চারিদিক থেকে পাথর আর গাছ নিয়ে এলো, নল সাগরের উপর সেতু বাঁধতে সুরু করলো।

আছিল নলের বন সাগরের তীরে।
তাহা ভাঙ্গি ফেলে দিল জলের উপরে ॥
তাহার উপরে গাছ দিল বিছাইয়া।
উপরে পাথর সব দিল চাপাইয়া ॥
দীর্ঘ এক যোজন বান্ধিল এক দিনে।
উত্তর আরম্ভ করি চলিল দক্ষিণে ॥

সমুদ্রের জলে পাথর ভাসিয়ে সেতু তৈরী হোল।



লঙ্কাকাণ্ড

বান্ধা গেল সাগর, কটক হইল পার।
দিনে, দিনে রাবণের টুটে অহঙ্কার॥
ফাঁফর হইল রাজা গণি মনে, মনে।
দুই চর শুক আর সারনেরে ভণে॥
শুন শুক সারণ, তোমরা বুদ্ধিমান।
চর্চ্চ গিয়া রামের কটক সপ্রমাণ॥
রামের সহিত থাকে কোন্ মহাবীর।
লঙ্কায় আসিয়া কেবা রণে হবে স্থির॥

শুক সারণ বানর সেজে রামের সৈন্য দলে মিশে গেল। কিন্তু বিভীষণ তাদের দেখতে পেয়েই চিনে ফেললো। বানরেরা তাদের ধরে নিয়ে গেল রামের কাছে। রাম বললেন—তোমরা দূত, তোমাদের ছেড়ে দিলাম। রাবণকে গিয়ে বলো—

সবংশে বধিব আমি দুষ্ট দশাননে।
বিভীষণে বসাইব শূন্য সিংহাসনে॥

শুক ও সারণ ফিরে গিয়ে রাবণকে সব কথাই বললো।

এদিকে রামচন্দ্র লঙ্কা ঘিরে ফেললেন—

বাছিয়া বানর লয়ে প্রধান, প্রধান।
নীলবীর পূর্বদ্বার রাখিবারে যান॥
অঙ্গদের ঠাট যত সবে বাছে, বাছ।
এক হাতে পর্বত অপর হাতে গাছ॥

ধূলা উড়াইয়া তারা করে অন্ধকার।
মার মার শব্দে ধায় দক্ষিণের দ্বার॥
সুগ্রীব বলেন ডাকি, শুন হনুমান।
পশ্চিমের দ্বার রক্ষা কর সাবধান॥
উত্তরে কাহারে দিব না হয় প্রতীত।
আপনি সুগ্রীব রহে বানর সহিত॥

এই ভাবে পাঁচদিন গেল, রাবণের দিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

শ্রীরাম বলেন, শুন, হে অঙ্গদ বলী।
রাবণ রাজারে কিছু দিয়ে এস গালি॥

রাবণ সভা করে বসেছে—পাত্র মিত্র সেনাপতি, যত বড় বড় রাক্ষস বসেছে।

সভামধ্যে বলিছে রাবণ সবাকারে।
কপি নর আসিয়াছে, আমা মারিবারে॥
শিশু রাম, শিশু কপি, না জানে আমায়।
তেঁই সে আমার সনে যুঝিবারে চায়॥

সেনাপতিরা বললো—

বানর খাইতে সাধ ছিল বহুকালে।
হেন ভক্ষ্য মিলিল অনেক পুণ্যফলে॥
মানুষ দুটার মাংস বড়ই সুস্বাদ।
সবাকার ঘুচাব মাংসের অবসাদ॥
এই যুক্তি রাবণ সভায় করে বসে।
সহসা অঙ্গদ বীর উতরিল এসে॥

প্রকাণ্ড শরীর তার, মন্দ, মন্দ গতি।
পূর্বাচল হৈতে যেন এল দিনপতি॥
আকশে দেউটি যেন দুই চক্ষু জ্বলে।
মস্তক ঠেকেছে তার গগন মণ্ডলে॥
রাবণের সেনাপতি দ্বারে ছিল যারা।
অঙ্গদের অঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিল তারা॥
যেখানে রাবণ রাজা বসেছে দেওয়ানে।
লম্ফ দিয়া, গিয়া বীর বৈসে সেইখানে॥
সুমেরু পর্বত যেন অঙ্গদের দেহ।
রাক্ষসেরা বলে, বাপ! এটা এল কেহ॥
অঙ্গদেরে দেখি রাবণ মায়া পাতে।
শতেক রাবণ হয়ে বসিল সভাতে॥
যেদিকে অঙ্গদ চাহে সেদিকে রাবণ।
দশ মুণ্ড, কুড়ি বাহু, বিংশতি লোচন॥
সবাই রাবণ ভেদ নাহি এক জনে।
অঙ্গদ বলেন, কথা কব কার সনে॥

অঙ্গদ ইন্দ্রজিতকে চিনতে পেরে, বললো—

কোন্ বাপ তোর চেড়ীর অন্ন খাইল পাতালে।
কোন্ বাপ তোর বাঁধা ছিল, বল্ অশ্বশালে॥
কোন্ বাপ তোর বাঁধা ছিল জামদগ্ন্যের তেজে।
মোর বাপ তোর কোন্ বাপকে বেঁধেছিল লেজে॥
একে একে কহিলাম তোর সকল বাপের কথা।
এ সবারে কাজ নাই, তোর যোগী বাপটি কোথা॥

শূর্পনখার কাছে যেই লয়েছিল দীক্ষা।
দণ্ডক কাননে যে মাগিয়া খায় ভিক্ষা॥
শঙ্খের কুণ্ডল কর্ণে, রক্ত বস্ত্র পরে।
ডমরু বাজায়ে ভিক্ষা করে ঘরে ঘরে॥
সন্ন্যাসীর বেশ ধরে মুখে মাখে ছাই।
এ সবারে কাজ নাই, তোর সেই বাপটি চাই॥
রাবণ বলে, শোনরে, বানরা, তোরে বলি।
কোথা হতে মরিতে এ লঙ্কাপুরে এলি॥

অঙ্গদ বললো—বালি আর সুগ্রীব দুই বীর অবতার।
জিনিবারে কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়াছিলি একবার॥
পড়ে কিনা পড়ে মনে, হৈল অনেক দিন।
হাত বুলায়ে দেখ, গলে আছে লেজের চিন॥
সেই বালির সুত আমি, সুগ্রীবের চর।
অঙ্গদ নাম ধরি আমি রামের কিঙ্কর॥
রামকে জানিস নাই, আনলি সীতা ধরে।
এখন দেখি লঙ্কাপুরী রাখিস্ কেমন করে॥

রাবণ বললো—এনেছি ত রামের সীতা, বল্‌গে তুই তারে।
করুক এসে রামতপস্বী প্রাণে যত পারে॥
ধনুক্ বাণ ফেলে রাম খত্ দিক নাকে।
সব দোষ ভুলে, তবে, ক্ষমা করি তাকে॥

অঙ্গদ বললো—বুদ্ধিমন্ত হয়ে জ্ঞান হারালি অভাগা।
শরে কৈল সর্পাঘাত, কোথা বাঁধবি তাগা॥
বিভীষণের কথা তুই না শুনিলি কাণে।
সুখে শয্যা কর গিয়া শ্রীরামের বাণে॥

শুনি অঙ্গদের বাণী সবে করে কানাকাণি
এ লঙ্কার নাহিক নিস্তার।
কোপে উঠে লঙ্কেশ্বর বলে রাজা ধর্ ধর্
দেখি অঙ্গদের অহঙ্কার॥

রাক্ষসেরা অঙ্গদকে ধরতে যায়, অঙ্গদ লাফিয়ে পড়ে রাবণের ঘাড়ের উপর।—

সিংহাসনে বসিয়া রাবণ তারে ধরে।
জড়াজড়ি করি পড়ে ভূমির উপরে॥
বালির তনয় সে বালির সম বল।
রাবণেরে প্রহারিয়া করিল বিকল॥
আছাড়ি রাবণে পরে বালির নন্দন।
মুকুট লইয়া বেগে উঠিল গগন॥
অঙ্গদের বিক্রমে রাবণ কাঁপে ডরে।
অধোমুখে উঠিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়ে॥

অঙ্গদ ফিরে গিয়ে শ্রীরামের কাছে রাবণের মুকুট অর্পণ করলো।

সেই দিনই যুদ্ধ সুরু হয়ে গেল। রাবণ ইন্দ্রজিতকে যুদ্ধ করতে পাঠালেন। ইন্দ্রজিত মেঘের আড়ালে থেকে যুদ্ধ করতে লাগলো—

নানা বর্ণে বাণ এড়ে, জানে নানা ছলা।
রাম লক্ষ্মণের কাটি পাড়িল মেখলা॥
তিলার্ধ নাহিক স্থান রক্ত পড়ে স্রোতে।
দু'ভায়ের রক্তধারে বসুমতী তিতে॥
লাফ দিয়া কপি সব উঠয়ে আকাশ।
কোথায় থাকিয়া যুঝে না পায় তল্লাস্॥

মেঘ আড়ে থাকি করে বাণ বরষণ।
জর্জর করিয়া বিন্ধে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
এত বাণ মারি বেটা ক্ষমা নাহি মানে।
নাগপাশ-বাণ জুড়ে ধনুকের গুণে॥
সাপ হয়ে আইসে বাণ, মুখে ধরে ফণা
সাপের মুখেতে জ্বলে আগুনের কণা॥
বায়ু বেগে যায় বাণ মেঘের গর্জনে।
হাতে, পায়ে বান্ধে গিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
হাত, পা নাড়িতে নারে, গলে লাগে ফাঁস।
যমের দোসর সম হৈল নাগপাশ॥
সাপের বিষের জ্বালে অধৈর্য শরীর।
উত্তর শিয়রে ঢলি পড়েন দুই বীর॥
রণ জিনি ইন্দ্রজিৎ ছাড়ে সিংহনাদ।
পিতৃস্থানে যায় বীর লইতে প্রসাদ॥



খবর শুনে রাবণ তো ভারী খুসি।

এদিকে বানরদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল।

গরুড়ে স্মরেণ রাম বিষ্ণু অবতার।
গরুড়ের ললাটেতে পড়িল টঙ্কার॥
শূন্য ভরে গরুড় আইল উভরড়ে।
পাকসাটে পর্বত কন্দর যায় উড়ে॥
দূর হইতে গরুড়ের লাগিল নিশ্বাস।
রাম লক্ষ্মণের খসি পড়ে নাগপাশ॥
নাগপাশ মুক্ত হৈল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রামজয় শব্দ করে যত কপিগণ॥
আনন্দে বানরগণ ছাড়ে সিংহনাদ।
লঙ্কায় রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ॥
প্রাচীরে উঠিয়া রাবণ চায় চারিভিতে।
শ্রীরাম, লক্ষ্মণে হেরে ধনুর্বাণ হাতে॥

রাবণ তখনই সেনাপতিদের ডেকে যুদ্ধে পাঠালো।

প্রথমে গেল ধূম্রাক্ষ।—

হনুমান মহাবীর সংগ্রামের শূর।
লাথি মারি ধূম্রাক্ষের অঙ্গ করে চূর॥
পড়িল ধূম্রাক্ষ বীর সমরে দুর্জয়।
সকল বানর ডাকে রাম জয়, জয়॥

তারপর এল অকম্পন।—হনুমানের হাতে সেও মারা পড়লো।—

চুলেতে ধরিয়া তারে মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি, চূর্ণ হৈল হাড়॥

অকম্পন পড়ে যদি, সংগ্রামে দুর্জয়।
সকল বানর বলে, রাম জয়, জয়॥

তারপর এল রাবণের মামা প্রহস্ত। নীলের হাতে প্রহস্ত মারা পড়লো।—

ভাঙ্গিয়া আনিল বীর পর্বতের চূড়া।
প্রহস্তের মাথে মেরে মাথা কৈল গুঁড়া॥

এবার রাবণ নিজেই এলো যুদ্ধে।—

তিন শত বাণ রাবণ যুড়িল ধনুকে।
গর্জিয়া মারিল বাণ সুগ্রীবের বুকে।
বাণ খেয়ে সুগ্রীব সঘনে ঘুরে বুলে।
ভাগ্যেতে বাঁচিল প্রাণ পূর্ব পুণ্যফলে॥
হনুমান বুকে মারে বজ্রের চাপড়।
রথ হৈতে পড়ে হনু করে ধড়ফড়॥
বাণ খেয়ে নীল বীর পড়ে ভূমিতলে।
ভাগ্যেতে বাঁচিল প্রাণ পূর্ব পুণ্যফলে॥
নীলবীর হনুমান হইল বিমুখ।
লক্ষ্মণ আইল রণে পাতিয়া ধনুক॥
লক্ষ্মণ, রাবণ করে বাণ বরষণ।
দুজনার বাণে ঢাকে রবির কিরণ॥

কিন্তু শেষ অবধি লক্ষ্মণ পারলেন না, শেলের আঘাতে জ্ঞান হারালেন। রাবণ লক্ষ্মণকে রথে তুলে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। রামচন্দ্র এলেন লড়তে। রামের বাণ রাবণ সইতে পারলো না, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল।

জে হেরে গিয়ে রাবণ হতাশ হয়ে পড়লো।

রাবণ বলে, বড় লজ্জা পাইলাম রণে।
রাজা হয়ে হারিলাম, জিনে কোন জনে॥

মনে পড়লো মেজো ভাই কুম্ভকর্ণের কথা। সে তো রাক্ষস নয়, একটা পাহাড়। সে পাছে পৃথিবীর সব কিছু খেয়ে ফেলে ব্রহ্মা তাই বিধান দিয়েছিলেন যে সে ছ'মাস ঘুমুবে আর একদিন জাগবে। কিন্তু ছ'মাসের আগে জাগলে যেদিন জাগবে সেইদিনই তার মৃত্যু। তবু রাবণ কুম্ভকর্ণকেই জাগাতে আদেশ দিলেন।

বাজায় দামামা, ঢাক চারিদিকে বেড়ে।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ, কর্ণ নাহি নড়ে॥
বাজায় কর্ণের কাছে বড়, বড় শাঁখ।
দ্বিগুণ বাড়িল আরো নাসিকার ডাক॥
রাজার ভাই বলি কেহ নাহি করে ডর।
বুকের উপর মারে বৃক্ষ আর পাথর॥
মুষল, মুদগর কেহ অঙ্গে মারে তেড়ে।
সাঁড়াসিতে মাংস টানে, শেল শূলে ফোঁড়ে॥



কেহ কামড়ায়, কেহ চুলে ধরি টানে।
ব্রহ্মশাপে নিদ্রা যায় কিছুই না জানে॥

শেষে মদ্য ও মাংসের গন্ধ শোঁকানো হোল। খাবার লোভে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভেঙে গেল। সবার আগে কুম্ভকর্ণ পেট ভরে খেল—

মদ্য পান করিলেক কলসী, কলসী।
পর্বত প্রমাণ মাংস খায় রাশি, রাশি॥

তারপর রাবণ কুম্ভকর্ণকে সব কথা বললো, কুম্ভকর্ণকে পাঠিয়ে দিল যুদ্ধ করতে ;—

ভঙ্গ দিয়া বানর পলায় সব ডরে।
কুম্ভকর্ণ রণ কেহ সহিতে না পারে॥
বানর ধরিয়া বীর চিবাইছে দাঁতে।
মুখ সম্বরিতে নারে, রক্ত পড়ে স্রোতে॥
লাফ দিয়া কুম্ভকর্ণ বীর অঙ্গদেরে।
মূর্ছিত করিল তারে গদার প্রহারে॥
হনুমানের বুকে মারে বজ্রের চাপড়।
চাপড়ের ঘায়ে হনু করে ধড়ফড়॥
এড়িল পর্বত গোটা বিপরীত কোপে।
পড়িল সুগ্রীব রাজা পর্বতের চাপে॥

কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবকে ধরে নিয়ে চললো লঙ্কায়। সুগ্রীব কুম্ভকর্ণের নাক কান কামড়ে নিল। সেই নাক কান এনে উপহার দিল রামের কাছে।

নাক কান নাহি কুম্ভকর্ণ পায় লাজ।
মনে মনে ভাবে আর জীবনে কি কাজ॥
এত বল, বিক্রম সকল হৈল মিছা।
সুগ্রীব বানরা বেটা করে গেল বোঁচা॥

একে কুম্ভকর্ণ বীর অতি ভয়ঙ্কর।
কর্ণ নাসা গেছে আরো হয়েছে দুষ্কর॥
কোপদৃষ্টে কুম্ভকর্ণ যে দিকেতে চায়।
বড় বড় বীর সব ছুটিয়া পলায়॥

শেষে রামচন্দ্র এলেন।—

ছাড়িলেন ব্রহ্ম অস্ত্র পূরিয়া সন্ধান;
কুম্ভকর্ণের কাটিলেন ডানি হাতখান॥
হাতখান পড়ে যেন পর্বত-শিখর।
হাতের চাপনে পড়ে অনেক বানর॥
বাম হস্তে শালগাছ উপাড়িয়ে আনে।
হাতে গাছ করি গেল রামের সদনে॥
শ্রীরাম ঐষিক বাণ পূরিয়া সন্ধান।
এক বাণে কাটিলেন বাম হাত খান॥
পরে ইন্দ্র অস্ত্র রাম করিয়া সন্ধান।
কুম্ভকর্ণের কাটিলেন পদ দুইখান॥
হস্ত গেল, পদ গেল, তবু নাহি ডরে।
গড়াগড়ি দিয়া যায় রামে গিলিবারে॥
ব্রহ্ম অস্ত্র বাণে আর নাহিক অন্যথা।
সেই বাণে কুম্ভকর্ণের কাটিলেন মাথা॥
ভগ্নদূত কহে গিয়া রাজা লঙ্কেশ্বর।
কুম্ভকর্ণ পড়িয়াছে সংগ্রাম ভিতর॥
সিংহাসন হতে পড়ে শুনে দশানন।
অশ্রুজলে ভাসে তার অঙ্গের বসন॥

আবার ইন্দ্রজিৎ এলো যুদ্ধ করতে। মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করে আগের বারের মত সকলকে অজ্ঞান ক'রে সে যুদ্ধ জয় করে ফিরে গেল।

জাম্বুবান হনুমানকে পাঠালেন হিমালয় থেকে ঔষধ আনবার জন্য। হনুমান পবনের পুত্র, বাতাসের মত বেগে যাতায়াত করতে পারতো। এক রাত্রির মধ্যে হিমালয় থেকে সে ঔষধ নিয়ে ফিরে এলো। সেই ঔষধের গন্ধে সকলেই সুস্থ হয়ে উঠলো।

রামজয় শব্দে কপি ছাড়ে সিংহনাদ।
লঙ্কাতে রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ॥

রাবণ খরের ছেলে মকরাক্ষকে পাঠালো। মকরাক্ষ এক নূতন ফন্দী করলো—

বড়ই ধার্মিক রাম ধর্ম্মেতে তৎপর।
অস্ত্রাঘাত না করিবে গরুর উপর॥
এতেক ভাবিয়া মকরাক্ষ নিশাচর।
যুক্তি করে ধেনু, বৎস আনয়ে বিস্তর॥
নব নব বৎস সব রথে লয়ে তোলে।
রথের চৌদিকে ধেনু বান্ধে পালে পালে॥

মকরাক্ষ রামকে বাণ মেরে জর্জরিত করে তুললো। কিন্তু রামচন্দ্র কিছুই করতে পারলেন না।—

মনে মনে রঘুনাথের হৈল এই ভয়।
মকরাক্ষ মারিতে গোহত্যা পাছে হয়॥

শেষে রাম পবন বাণে ঝড় তুলে সব গরু উড়িয়ে দিলেন। তারপর—

অগ্নিবাণ জুড়িয়া ধনুকে দিল টান।
অগ্নিবাণে মকরাক্ষের বাহিরায় প্রাণ॥

এবার এলো বিভীষণের ছেলে তরণীসেন। যুদ্ধে যাবার সময় তরণীসেন

বলে গেল—পিতা হন, ভ্রাতা হন, হউন জননী।
দেশের যে শত্রু, তারে শত্রু বলি গণি॥

প্রথম লড়লো নীল,—

পর্বত হইল গুঁড়া গদার প্রহারে।
তরণী হানিল বাণ নীলের উপরে॥
মুখে রক্ত উঠে, বীর হইল অজ্ঞান।
নীল বীর ভঙ্গ দেখি রোষে হনুমান॥
দুই জনে মহাযুদ্ধ রথের উপরে।
কোপেতে তরণী সেন হনুমানে ধরে॥
আছাড়িয়া ফেলে দিল ধরণী উপর।
পাছু হইল হনুমান পাইয়া ত ডর॥
রুষিল তরণী সেন অঙ্গদ উপর।
অঙ্গদের বুকে মারে লৌহের মুদ্গর॥
মুদ্গর আঘাতে পড়ে বালির নন্দন।
হেরি ভয়ে আগু নাহি হয় কোন জন॥
হানিল দুর্জয় জাঠা, সুগ্রীবের বুকে।
পড়িল সুগ্রীব রাজা রক্ত উঠে মুখে॥

তারপর হোল লক্ষ্মণের সঙ্গে লড়াই। তরণীসেনের মার খেয়ে লক্ষ্মণ জ্ঞান হারালেন। রাম তখন ব্রহ্ম অস্ত্রে তরণীসেনকে বধ করলেন।

বিভীষণ বলে, প্রভু করি নিবেদন।
মরিল তরণী সেন, আমার নন্দন॥
শ্রীরাম বলেন, শুন, মিত্র বিভীষণ।
না জানি হৃদয় তব কঠিন কেমন॥

ব্রহ্ম-অস্ত্র মারিতে মন্ত্রণা দিলে কাণে।
আপনি করিলে বধ আপন সন্তানে॥
আগে কেন বিবেচনা না করিলে মনে।
এক্ষণে কান্দহ মিত্র, কিসের কারণে॥

রাবণ এবার পাঠালেন পুত্র বীরবাহুকে। বীরবাহুর সঙ্গে এলো ভস্মাক্ষ। ভস্মাক্ষ যার মুখের পানে তাকাবে সেই ভস্ম হয়ে যাবে—ব্রহ্মার বরে। সেই জন্য সব সময় সে চোখে ঠুলি দিয়ে রাখতো। ভস্মাক্ষ বরাবর রামের সামনে এসে চোখের ঠুলি খুললো। রামচন্দ্র প্রস্তুত ছিলেন :—

রাম দেখিবারে বীর মেলিল লোচন।
রাক্ষস সম্মুখে রাম ধরিলা দর্পণ॥
দর্পণ ভিতরে দেখি আপনার আস্য।
নিজ মুখ দেখিয়া আপনি হৈল ভস্ম॥

বীরবাহু একাই লড়তে লাগলো। —

পাঁচ বাণ হানিলেক অঙ্গদের বুকে।
পড়িল অঙ্গদ বীর, রক্ত উঠে মুখে॥
ক্রোধ ভরে বীরবাহু এড়ে দশবাণ।
বাণ ফুটে ভূমিতে পড়িল হনুমান॥

তারপর যুদ্ধ হোল রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে। শেষে লক্ষ্মণ—

দুর্জয় বৈষ্ণব অস্ত্র ধনুকেতে যুড়ি।
আকর্ণ পূরিয়া গুণ দেন বাণ ছাড়ি॥
অব্যর্থ বৈষ্ণব বাণ কি কহিব কথা।
মুকুট সহিত কাটে বীরবাহুর মাথা॥

রাবণ আবার ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে যেতে বললেন। ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে যাবার

আগে এক যজ্ঞ করতো—নিকুম্ভিলা যজ্ঞ। যজ্ঞ শেষ করে এলে সে যুদ্ধে কেউ তাকে হারাতে পারতো না। পাছে সেই যজ্ঞ করার সময় কোন বিঘ্ন হয়, তাই ইন্দ্রজিৎ এক মায়া-সীতা তৈরী করে তাকে রথে বসিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এলো, এবং সকলের সামনে খড়গ দিয়ে সীতার মাথা কেটে ফেললো। রাম লক্ষ্মণ হাহাকার করে উঠলেন। যে সীতাকে উদ্ধার করার জন্য এতো লড়াই সেই সীতাকেই কেটে ফেললো!

এদিকে যখন হাহাকার পড়ে গেছে, ইন্দ্রজিৎ তখন অবসর বুঝে যজ্ঞ শেষ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। বিভীষণ এই কৌশল ধরে ফেললো, রামকে বললো—ওটি মায়া-সীতা। ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ করতে গেছে, নিশ্চিন্তে যজ্ঞ করার জন্য সে আমাদের শোকাচ্ছন্ন করে গেল।—

নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করে দুষ্ট নিশাচর।
করিয়াছে যজ্ঞকুণ্ড লঙ্কার ভিতর॥
যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া যদি যায় রণে।
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালেতে কার সাধ্য জিনে॥
ব্রহ্মা দিয়াছেন শাপ, শুন নারায়ণ।
ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ ভঙ্গ করিবে যে জন॥
ইন্দ্রজিতা সংগ্রামে মরিবে তার হাতে।
লক্ষ্মণে পাঠায়ে দেহ আমার সঙ্গেতে॥
আহুতি ঢালিয়া যজ্ঞ করিতেছে সাঙ্গ।
এ সময়ে গিয়া তার যজ্ঞ করি ভঙ্গ॥

বিভীষণ লক্ষ্মণকে নিয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করলেন। সঙ্গে চললো হনুমান। হনুমান প্রথমেই যজ্ঞকুণ্ডে গিয়ে যজ্ঞ নষ্ট করলো—

ইন্দ্রজিতে দেখিয়া হনুর কোপ বাড়ে।
এক লাফে পড়ে গিয়া যজ্ঞকুণ্ড পাড়ে॥

সম্মুখে দাণ্ডায় বীর পরম সন্ধানী।
বৃক্ষ বাড়ি মারি নিবায় যজ্ঞের আগুনি॥
যজ্ঞদ্রব্য ছড়াইয়া ফেলে চারিভিতে।
দেখি ক্রোধে সংগ্রামে সাজিল ইন্দ্রজিতে॥
লাফ দিয়া হনুমান পড়ে তার রথে।
চূর্ণ কৈল রথখান এক পদাঘাতে॥
ভাঙ্গিয়া রথের ধ্বজ ফেলে চারিভিতে।
অন্তরীক্ষে পলাইতে চাহে ইন্দ্রজিতে॥
অন্তরীক্ষে দুই জনে লাগে হুড়াহুড়ি।
ভূমিতলে পড়ে দোঁহে করি জড়াজড়ি॥
হেঁটে ইন্দ্রজিৎ পড়ে, হনু তদুপরে।
বুকে হাঁটু দিয়া তার গলা চেপে ধরে॥
ইন্দ্রজিৎ পলায়ে লঙ্কায় যেতে চাহে।
চাপিয়া লঙ্কার দ্বার বিভীষণ রহে॥



লক্ষ্মণের **সঙ্গে** ইন্দ্রজিতের লড়াই বাধলো—

চারিদিকে পড়ে বাণ নাহি লেখা জোখা।
দুই জনে বাণ এড়ে যার যত শিক্ষা॥
এত বাণ দুই বীরে করে অবতার।
দশ দিক লঙ্কাপুরী হৈল অন্ধকার॥

শেষে ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের মাথা কেটে ফেললেন।

দূত মুখে শুনি মেঘনাদের মরণ।
সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন॥
উচ্চৈঃস্বরে ডাকি বলে, কোথা ইন্দ্রজিৎ।
আছাড় খাইয়া পড়ে হইয়া মূর্ছিত॥
স্পন্দহীন মন্দোদরী ধরাতলে পড়ে।
শিরে জল ঢালে, কেহ দেখে নেড়ে চেড়ে॥
নাসিকাতে হস্ত দিয়া দেখিছে সবাই।
কেহ বলে, বেঁচে আছে, কেহ বলে, নাই॥
চৈতন্য পাইয়া বলে, কোথা ইন্দ্রজিৎ।
দেখা দিয়া প্রাণ রাখ মায়ের ত্বরিত॥
পুত্রশোকে মন্দোদরী করিছে রোদন।
মন্দোদরীর রোদনেতে রুষিল রাবণ॥
সীতা লাগি মজিল কনক লঙ্কাপুরী।
আজি সীতা কাটিয়া ঘুচাব সব বৈরী॥
খড়্গ হাতে ধায় রাবণ অশোকের বনে।
কার সাধ্য প্রবোধিয়া ফিরায় রাবণে॥
আতঙ্কে অস্থিরা সীতা দেখিয়া রাবণে।
কাটিবে রাবণ আজি ভাবিলেন মনে॥

এত ভাবি সীতাদেবী করেন রোদন।
সীতারে কাটিতে খড়গ তুলিল রাবণ॥
পিছে আসি সাপটিয়া ধরে মন্দোদরী।
ছি, ছি! মহারাজ, বধ করো না হে নারী॥
একে দেখ, মজেছে কনক লঙ্কাপুরী।
পাপেতে মজনা তাহে বধ করে নারী॥
মন্দোদরী বাক্যে রাজা ফিরে আইল ঘরে।
সিংহাসন ত্যজি বৈসে ভূমির উপরে॥

লঙ্কায় আর বীর নেই, এবার রাবণ নিজেই যুদ্ধে চল্‌লেন। প্রথমে হোল রামের সঙ্গে যুদ্ধ।—

বাণাঘাতে রঘুনাথ হৈল অচেতন।
রামে পাছু করি আগে রহিল লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণ যে বাণ মারে বলে মহাবল।
সারথির মুণ্ড কাটি পাড়ে ভূমিতল॥
লক্ষ্মণের বাণে রথ হইল যে মুড়া।
পদাঘাতে বিভীষণ মারে অষ্ট ঘোড়া॥
কোপে দশানন বিভীষণ পানে চায়।
তুলিয়া নিলেক শেল, দেখে ভয় পায়॥
বংশনাশ করিলি, পাপিষ্ঠ বিভীষণ।
মারিয়া পাড়িব তোরে রাখে কোন্ জন॥
শেলের উদ্দেশেতে লক্ষ্মণ এড়ে বাণ।
তিন বাণে শেল কাটি কৈল চারিখান॥

রাবণ এবার লক্ষ্মণের উপর শক্তিশেল মারলো।—

পড়িল লক্ষ্মণ বীর রঘুবংশ চূড়া।
প্রবেশে সকল শেল, বাহিরেতে গোড়া॥

ভূমেতে পতিত বীর, না নাড়েন পাশ।
শেল বিন্ধি লক্ষ্মণের ঘন বহে শ্বাস॥

এবার রাম এলেন যুদ্ধে।—

শ্রীরামের বাণে রাবণ করে ধড়ফড়।
সহিতে না পারি আর উঠে দিল রড়॥
লঙ্কাতে পলায়ে যায় রাজা লঙ্কেশ্বর।
পশ্চাতে বানর ধায় বলে ধর ধর॥
রণ জিনি রঘুনাথ পায়ে অবসর।
লক্ষ্মণেরে কোলে করি কান্দেন বিস্তর॥
কি কুক্ষণে ছাড়িলাম অযোধ্যা নগরী।
মৈল পিতা দশরথ, রাজ্য-অধিকারী॥
জনক-নন্দিনী সীতা প্রাণের সুন্দরী।
দিনে দুই প্রহরে রাবণ কৈল চুরি॥
হারানু প্রাণের ভাই অনুজ লক্ষ্মণে।
কি করিবে রাজ্য ভোগে, পুনঃ যাই বনে॥



রাজ্য ধনে কার্য নাই, নাহি চাই সীতে।
সাগরে ত্যজিব প্রাণ তোমার শোকেতে॥

সুষেণ বানরদের চিকিৎসক, সে হনুমানকে ডেকে বললো—গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে ঔষধ নিয়ে এসো।—

রাত্রিতে ঔষধ আন বাঁচাব সহজে।
রজনী প্রভাতে প্রাণ যাবে সূর্য তেজে॥

হনুমান ছুটলো বিশল্যকরণী আনতে।

দুর্জয় শরীর বীর চলে অন্তরীক্ষে।
লঙ্কার ভিতরে থাকি দশানন দেখে॥
দশানন বুঝিল করিয়া অনুমান।
ঔষধ আনিতে যায় বীর হনুমান॥

রাবণ তখনই গন্ধমাদন পর্বতে পাঠিয়ে দিলেন কালনেমিকে। সে তপস্বী বেশে হনুমানকে অভ্যর্থনা জানালো। সে ছলে হনুমানকে মারতে গিয়েছিল, হনুমান তার মায়া ধরে ফেললো—

লেজে জড়াইয়া তারে ঘুরায় আকাশে।
লঙ্কাতে ফেলিয়া দিল রাবণের পাশে॥

তারপর অনেক খোঁজাখুঁজি করেও হনুমান ঔষধ চিনতে পারলো না। শেষে হনুমান—

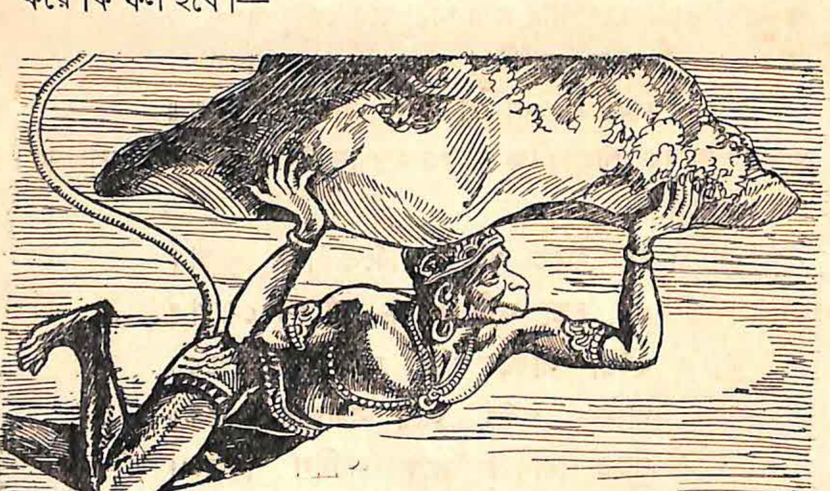
দুই হাতে ধরিয়া পর্বতে দিল নাড়া।
চড়্ চড়্ করি ছিঁড়ে পর্বতের গোড়া॥
হইয়া সাগর পার চলে বায়ু বেগে।
রাখিল পর্বত লয়ে সবাকার আগে॥
পর্বত দেখিয়া সবে লাগিল বিস্ময়।
প্রণাম করিয়া বীর রঘুনাথে কয়॥

ঔষধ চিনিতে নাহি পারি কোন মতে।
এ কারণে আনিলাম পর্বত সমেতে॥

সুষেণ বিশল্যকরণী ঔষধ নিয়ে লক্ষ্মণকে বাঁচিয়ে তুললেন। আবার রাবণ এলো যুদ্ধে। প্রচণ্ড লড়াই হোল—

আরবার বাজে যুদ্ধ শ্রীরাম রাবণে।
বাণের আগুন গিয়া উঠিল গগনে॥
বাণে বাণে ক্ষত দেহ হৈল দুজনার।
দশানন সমর সহিতে নারে আর॥
অচৈতন্য হয়ে রাজা ধূলায় ধূসর।
অম্বিকাকে স্তব করে হইয়া কাতর॥

দশানন ছিলেন দুর্গার ভক্ত, স্তব করতেই দেবী এসে রাবণকে রক্ষা করলেন। সহসা শ্রীরাম দেখলেন রাবণের রথে দুর্গা রাবণকে কোলে নিয়ে বসেছেন। দেবী যখন রাবণকে রক্ষা করছেন তখন আর যুদ্ধ করে কি ফল হবে।—



বিষণ্ণ হইয়া রাম বসিলা ভূতলে।
পরম বিমর্ষ হয়ে ভাবেন সকলে॥

শ্রীরাম স্বপ্ন দেখলেন, ব্রহ্মা এসে বলছেন 'দুর্গার পূজা করে তাঁকে প্রসন্ন করলে রাবণকে সংহার করা সহজ হবে।' রাম একশো আটটি নীল পদ্ম দিয়ে দেবীর পূজার আয়োজন করলেন। কিন্তু দেবীর চরণে পদ্ম দিতে গিয়ে দেখলেন, একশো আটটি পদ্ম নেই, একটি কম পড়েছে। তখন তো আর পদ্মের জন্য অপেক্ষা করার সময় নেই,—

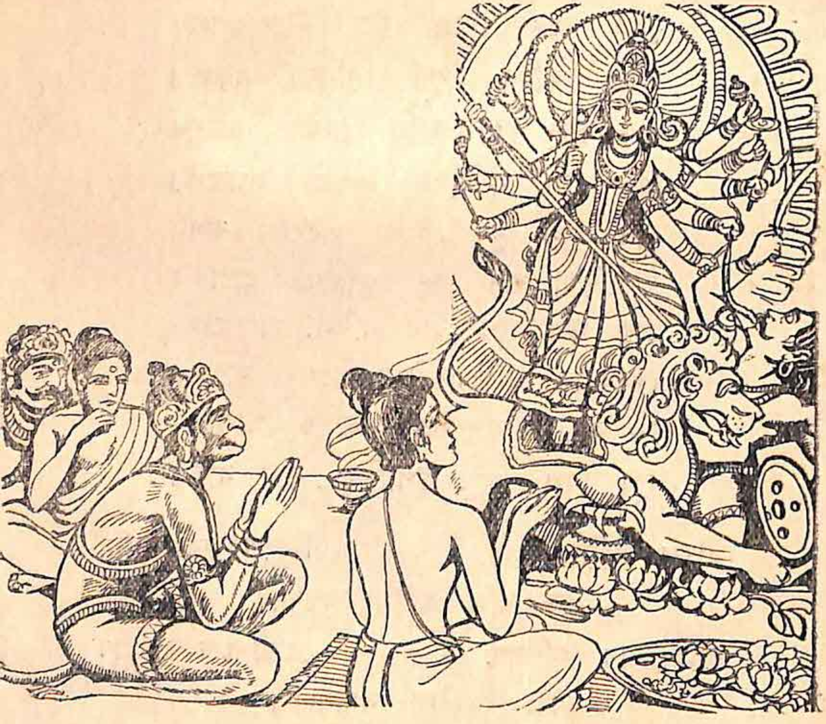
ভাবিতে ভাবিতে রাম বিচারেন মনে।
নীল কমলাক্ষ মোরে বলে সর্বজনে॥
যুগল নয়ন মোর ফুল্ল নীলোৎপল।
সঙ্কল্প করিব পূর্ণ বুঝিয়া সকল॥
এক চক্ষু দিব আমি দেবীর চরণে।
এত বলি কহিলেন অনুজ লক্ষ্মণে॥
এত বলি তূণ হইতে লইলেন বাণ।
উপাড়িয়া যান চক্ষু করিতে প্রদান॥
চক্ষু উপাড়িতে রাম বসিলা সাক্ষাতে।
হেনকালে কাত্যায়নী ধরিলেন হাতে॥
কি কর, কি কর, প্রভু, জগত গোঁসাই।
পূর্ণ হৈল, চক্ষু উপাড়িয়া কার্য নাই॥

রাবণে ছাড়িনু আমি, বিনাশ করহ তুমি,
এত বলি হইলা অন্তর্ধ্যান।
নাচে, গায় কপিগণ, প্রেমানন্দে নারায়ণ
নবমী করিলা সমাধান॥

দশমীতে পূজা করি বিসর্জিয়া মহেশ্বরী
সংগ্রামে চলিলেন রঘুপতি।
আদেশ পাইলা রাম সিদ্ধ হৈল মনস্কাম
কৃত্তিবাস গায় হৃষ্টমতি॥

এই সময় বিভীষণ বললেন—রাবণকে মারা সহজ নয়—

বিভীষণ বলে, প্রভু, কর অবধান।
রাবণের গৃহে আছে তার মৃত্যুবাণ॥
সেই বাণ রাখিয়াছে মন্দোদরী রাণী।
কোথায় রেখেছে অস্ত্র কিছুই না জানি॥



কিন্তু সেই বাণ কে আনবে?

হনুমান বলে প্রভু, কর আশীর্বাদ।
এখনি আনিব বাণ কি হেতু বিষাদ॥

হনুমান জ্যোতিষী ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে মন্দোদরীর কাছে গেল। মন্দোদরী তাকে আদর করে বসালেন। জ্যোতিষী বললো—রাণী, তুমি কিছু ভেবো না, রাবণ অমর, কেউ তাকে মারতে পারবে না। তোমার কাছে রাবণের যে মৃত্যুবাণ আছে, তা যেন ঠিক থাকে, কোথায় তাকে রেখেছ তা কাউকে জানিও না। নইলে ঘর-শত্রু বিভীষণ যে আছে সে সর্বনাশ করবে?

মন্দোদরী বললো—বিভীষণের সাধ্য কি যে সে বাণ বের করে, তা আমি রেখে দিয়েছি এই স্ফটিকের থামের মধ্যে।

আর যায় কোথা! তখনই হনুমান নিজের রূপ ধরে লাথি মেরে স্ফটিকের থাম ভেঙে ফেললো।—

ভাঙিতে স্ফটিক স্তম্ভ দৃষ্ট হইল বাণ।
বাণ লয়ে লাফ দিল বীর হনুমান॥



নিজ মূর্তি ধরি গিয়া বসিল প্রাচীরে।
আর এক লাফে গেল রামের গোচরে॥
বাণ দিয়ে রঘুনাথে করিল প্রণাম।
মহানন্দে হনুমানে কোল দেন রাম॥

এইবার রামচন্দ্র সেই বাণ ধনুকে যুড়লেন।—

বাণের গর্জনে ত্রিভুবনে লাগে ডর।
পর্বত উপাড়ি পড়ে, উথলে সাগর॥
বিশ্বামিত্র স্মরি বাণ ছাড়ে রঘুবীর।
রাবণের বুক বিন্ধি কৈল দুই চির॥

রাবণের মৃত্যু হোল। বিভীষণ রাবণের সৎকার করলেন।— তারপর বিভীষণ হলেন লঙ্কার রাজা।

বিভীষণের স্ত্রী সরমা সীতাকে সাজিয়ে দিল, বিভীষণ সীতাকে নিয়ে এলো রামের কাছে। যাবার পথে মন্দোদরী সীতাকে অভিশাপ দিলেন—

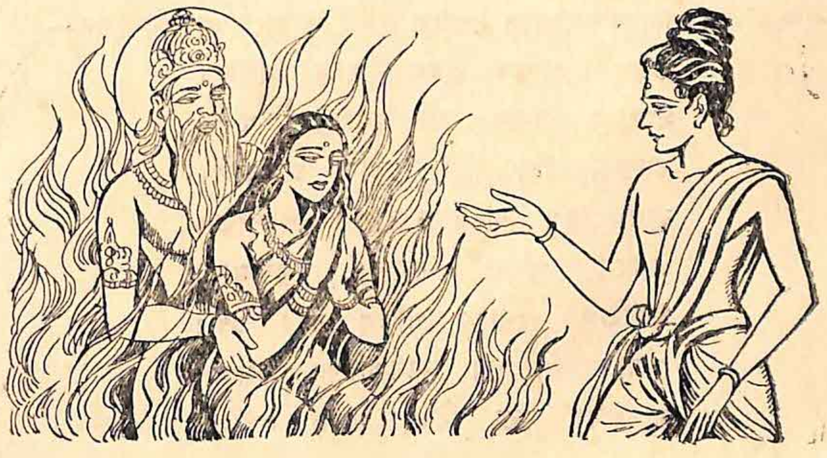
মন্দোদরী বলে শুন, জনক-নন্দিনী।
তোমা লাগি হইলাম আমি অনাথিনী॥
পুরীসহ বিনাশ করিয়া কোপাগুনে।
আনন্দে চলেছ তুমি রাম সম্ভাষণে॥
এ আনন্দ নিরানন্দ হবে অকস্মাৎ।
বিষ দৃষ্টে তোমাকে দেখিবে রঘুনাথ॥
যদি সতী হই, থাকে পতি প্রতি মন।
কখন আমার শাপ না হবে খণ্ডন॥

মন্দোদরীর শাপ ফলে গেল, লোক নিন্দার ভয়ে রাম সীতাকে গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। সীতা মনের দুঃখে লক্ষ্মণকে বললেন— চিতা প্রস্তুত কর!

সীতার জীবনে, ভাই, কিছু নাই কাজ।
অগ্নিতে পুড়ুক সীতা, দূর হোক্ লাজ॥

লক্ষ্মণ চিতা সাজালো, সীতা আগুনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, সীতা আগুনে দগ্ধ হলেন না।

আকাশ, পাতাল যুড়ি অগ্নিশিখা জ্বলে।
আপনি উঠিলা অগ্নি সীতা লয়ে কোলে॥
অগ্নি হৈতে উঠিলেন সীতা ঠাকুরাণী।
যেমন, তেমনি আছে গাত্র-বস্ত্র খানি॥
অগ্নি বলিলেন, আমি পাপ পুণ্য সাক্ষী।
লুকাইয়া পাপ করে তাহা আমি দেখি॥
ভাণ্ডাইতে আমারে না পারে কোনজন।
না দেখি সীতার কোন পাপের লক্ষণ॥
শুন রাম, সীতারে না দিও মনস্তাপ।
রাজ্য দগ্ধ হইবে জানকী দিলে শাপ॥



শ্রীরামের হাতে সীতা করি সমর্পণ।
স্বস্থানে প্রস্থান অগ্নি করেন তখন॥

রাম এবার সীতাকে গ্রহণ করলেন।—

বসিলা রামের পাশে সীতা ঠাকুরাণী।
শ্রীপতির পাশে লক্ষ্মী শোভিলা যেমনি॥

রামচন্দ্র এবার পুষ্পক রথে চড়ে অযোধ্যায় ফিরে আসার আয়োজন করলেন।

শ্রীরাম বলেন শুন, জানকী এখন।
শিবপূজা করি দেশে করিব গমন॥
গড়িয়া বালির শিব দিলেন লক্ষ্মণ।
হনুমান আনিলেন কুসুম চন্দন॥
স্নান করি বসিলেন সীতা ঠাকুরাণী।
জাঙ্গালের উপরে পূজেন শূলপাণি॥
জাঙ্গাল উপরে শিব স্থাপিলেন রাম।
সে কারণে—সেতুবন্ধ রামেশ্বর নাম॥

পুষ্পক রথে নানা স্থান দেখতে দেখতে রাম সীতা অযোধ্যায় ফিরলেন—

উঠিল পুষ্পক রথ গগন মণ্ডল।
সীতাকে দেখান রাম সংগ্রামের স্থল॥
রণস্থলী দেখ, সীতা, তুমি ভালমতে।
রাঙ্গা হৈল বানর ও রাক্ষস শোণিতে॥
এখানে পড়িল কুম্ভকর্ণ দুষ্টজন।
ইন্দ্রজিত এখানে পড়িল করি রণ॥
হেথা পড়িলাম নাগপাশের বন্ধনে।
নাগপাশে মুক্ত হৈনু গরুড় দর্শনে॥

পড়িল লক্ষ্মণ হেথা রাবণের শেলে।
ঔষধি আনিল হনু সুষেণের বোলে॥
পড়িল রাবণ হেতা জগতের বৈরী।
এই স্থানে কান্দিল সে রাণী মন্দোদরী॥
তোমার লাগিয়া, সীতা, বান্ধিনু জাঙ্গাল।
উপরে পাথর, হেঁটে তমাল, পিয়াল॥
এই স্থানে বিভীষণ সহিত মিলন।
এইখানে সাগর দিলেন দরশন॥
কিষ্কিন্ধ্যায় দেখ এই গাছের ময়ালি।
সুগ্রীব হইল মিত্র, হেথা মারি বালি॥
পম্পা-সরোবর সীতা, কর নিরীক্ষণ।
ছিলেন ইহার কূলে মতঙ্গ ব্রাহ্মণ॥
জটায়ু পক্ষীর স্থান দেখহ, জানকী।
তোমা লাগি যুদ্ধ করি প্রাণ দিল পাখী॥
প্রমোদিয়া ঘর দেখ করিল লক্ষ্মণ।
এই ঘর হৈতে তোমা হরিল রাবণ॥
হেথা সেই রণস্থলী দেখহ সুন্দরী।
সহস্র রাক্ষসে, খরে দূষেণেরে মারি॥
অগস্ত্য মুনির স্থান দেখ পঞ্চবটি।
যথা শূর্পনখার নাসিকা, কাণ কাটি॥
চিত্রকূট গিরি সীতা ওই দেখা যায়।
আইল ভরত হেথা লইতে আমায়॥

রাম লক্ষ্মণ ফিরে এলেন। অযোধ্যায় চারি ভাইয়ের মিলন হোল। রাম এবার অযোধ্যার রাজা হলেন।

সীতা সহ শ্রীরাম বৈসেন সিংহাসনে।
অভিষেক করিলেন সুগ্রীব বিভীষণে॥
জলে, স্থলে, অরণ্যেতে দোঁহে রাজ্য করে।
দুই রাজা ছত্র ধরে রামের উপরে॥
পৃথিবীতে যত রাজা আছে চতুর্ভিত।
শ্রীরামের অভিষেকে দ্বারে উপস্থিত॥
চারিভিতে চামর ঢুলায় রাজগণ।
রামের সম্মুখে স্থিত ভাই তিন জন॥
দেবের ভূষণে রাম হইয়া ভূষিত।
রাজপাটে বসিলেন জগতে পূজিত॥



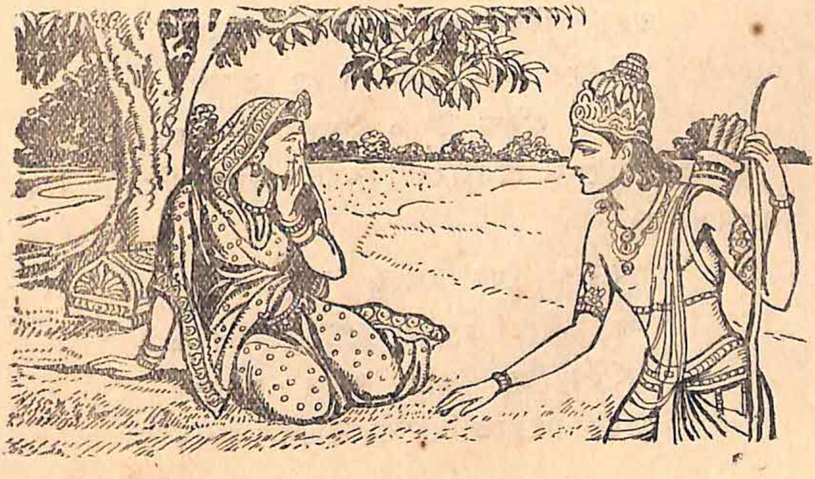
উত্তরাকাণ্ড

সীতার অদৃষ্টে সুখ সইল না। লোকে সীতার অপবাদ দিতে লাগলো। একদিন মহাপাত্র ভদ্র সভার মাঝে বললো।—

এই অপযশ তব সর্বজনে ঘোষে।
যে নারী হরণ করি লইল রাক্ষসে॥
রাখিয়াছে সেই নারী নিজ গৃহবাসে।
তোমার সম্মুখে কেহ নাহি কয় ত্রাসে॥

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে ডেকে বললেন—

আমার বচন শুন ভাইরে লক্ষ্মণ।
সীতা লয়ে রাখ গিয়া মুনি-তপোধন॥
বাল্মীকির তপোবন খ্যাত চরাচরে।
দেশের বাহিরে সীতা এড় লৈয়া দূরে॥



বাল্মীকির আশ্রমে লক্ষ্মণ সীতাকে রেখে এলেন।

সীতা গর্ভবতী ছিলেন। কালক্রমে বাল্মীকির আশ্রমে তাঁর দুটি ছেলে হোল—যমজ ছেলে। বাল্মীকি তাঁদের নাম রাখলেন—লব ও কুশ।

বাল্মীকি পালেন দোঁহে নিজ শিষ্য সনে।
ধনুর্বেদ রাজধর্ম শিখান যতনে॥
শ্রীরাম সীতার লীলা করিয়া রচন।
দোঁহারে শিখান মুনি করিতে কীর্তন॥

দেখতে দেখতে বারো বছর কেটে গেল। রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন।

বড় বড় যত মুনি আছেন ভুবনে।
একে একে সর্বজন আইলা সে স্থানে॥
দেশে, দেশে চলিল যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।
নিমন্ত্রণ পাইয়া আইল রাজগণ॥
অবধূত, সন্ন্যাসী আইল দেশান্তরী।
গন্ধর্ব, কিন্নর আইল স্বর্গ বিদ্যাধরী॥
পৃথিবীতে যত ছিল দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
যজ্ঞের দক্ষিণা লৈতে কৈল আগমন॥

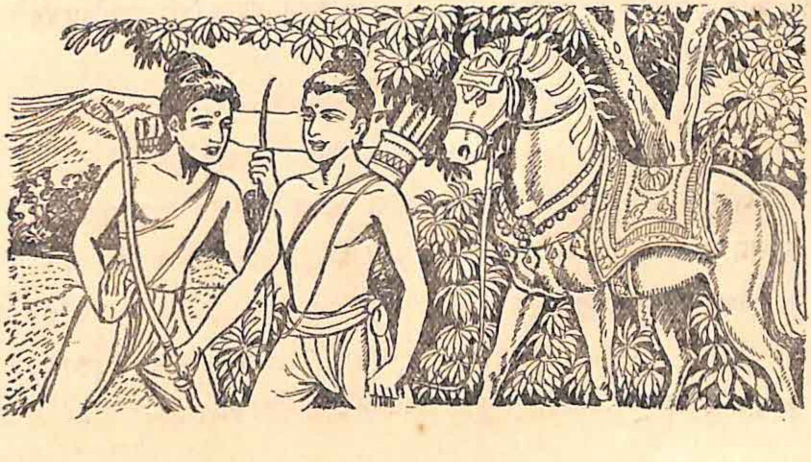
যজ্ঞের ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হোল কপালে জয়পত্র লিখে! সঙ্গে চললেন শত্রুঘ্ন।

পূর্বদেশে গেল ঘোড়া, বহুদূর পথ।
নদ নদী এড়াইয়া উঠিল পর্বত॥
পূর্বদিক জয় করি আইল শত্রুঘণ।
উত্তর দিকেতে ঘোড়া করিল গমন॥

দিগ্‌ দিগন্তরে ঘোড়া যায় দেশে দেশে।
ছ'মাসের পথ যায় চক্ষুর নিমেষে॥
একদিকে ঘোটক না যায় দুইবার।
পশ্চিমদিকেতে যায় সিন্ধু নদী পার॥
প্রায় যজ্ঞ সমাপণ হয় এইক্ষণে।
দৈবের নির্বন্ধে ঘোড়া গেল সে দক্ষিণে॥

লব কুশ দুই ভাই তপোবনে খেলা করছিলেন এমন সময় সেইখানে ঘোড়া এসে পৌঁছালো।—

দুই ভাই বৃক্ষতলে নানা খেলা খেলে।
হেনকালে অশ্ব এল সে গাছের তলে॥
ঘোড়া দেখি হরষ হইল দুইজন।
জয়পত্র তার ভালে দেখিল লিখন॥
জয়পত্র দেখি দুই ভাই কোপে জ্বলে।
জিজ্ঞাসা করিয়া ঘোড়া বান্ধে বৃক্ষতলে॥



ঘোড়া উদ্ধার করার জন্য শত্রুঘ্নের সঙ্গে লবকুশের যুদ্ধ বেধে গেল। কুশের বাণে শত্রুঘ্ন মারা পড়লেন।

গলায় লাগিল পাশ মৃত্যু দরশন।
মহাপাশ বাণাঘাতে পড়ে শত্রুঘণ॥

শত্রুঘ্নের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছালো অযোধ্যায়, ঘোড়া উদ্ধার করতে এলেন ভরত ও লক্ষ্মণ।

কুশে আর ভরতে বাজিল মহারণ।
মহাযুদ্ধ করে লব সহিতে লক্ষ্মণ॥

লব পাশুপাত বাণ মারলেন।—

বাসুকী-গর্জন সম বাণের গর্জন।
পাশুপাত বাণ বিন্ধে পড়িল লক্ষ্মণ॥

কুশ মারলেন ঐষিক বাণ।—

ভরত কাতর হয়ে ঊর্ধ্বপানে চায়।
বায়ুবেগে পড়ে বাণ ভরতের গায়॥

সংবাদ পৌঁছালো অযোধ্যায়। এবার এলেন শ্রীরামচন্দ্র। দু' ভাই পিতাকে কখনও দেখেন নি। দু'জনে এবার একসঙ্গে রামের সঙ্গে যুদ্ধ সুরু করলেন।—

একেবারে দুই ভাই পূরিল সন্ধান।
মূর্ছিত হইয়া ভূমে পড়িলা শ্রীরাম॥

লবকুশ এবার রামের সমস্ত বেশভূষা কেড়ে নিলেন। ফেরার পথে হনুমান ও জাম্বুবানকে বেঁধে নিয়ে চললেন। বাড়ী ফিরে বললেন— মা, দেখ কি এনেছি!

রামের সাজ পোষাক দেখেই সীতা হায় হায় করে উঠলেন। হনুমান ও জাম্বুবানের বাঁধন খুলে দিয়ে ছুটলেন যুদ্ধক্ষেত্রে।—

দেখিলেন সংগ্রামে পড়িয়া চারিজন।
শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, শ্রীভরত, শত্রুঘণ॥
হস্তী, ঘোড়া, ঠাট কত পড়েছে অপার।
দেখিয়াত জানকী করেন হাহাকার॥

লব কুশ এতদিন কে তাদের বাবা জানতো না, এবার সেই পরিচয় পেল। বাবা-কাকাকে হত্যা করেছে জেনে তাদের বড় দুঃখ হোল। সীতা ও লব-কুশ ঠিক করলেন আগুনে পুড়ে মরবেন। জাহ্নবীর তীরে তিনটি চিতা সাজানো হোল, চিতায় আগুন দেওয়া হোল। তিনজনে অগ্নিতে প্রবেশ করবেন বলে চিতা প্রদক্ষিণ করলেন।

এদিকে বাল্মীকি গিয়েছিলেন চিত্রকূট পর্বতে। তিনি সেখান থেকে চিতার ধোঁয়া দেখতে পেয়েই ছুটে এলেন।

বাল্মীকি বলেন, সীতা, প্রাণ ত্যাজ নাই।
বাঁচিবেন এখনি রাঘব চারি ভাই॥
ক্ষমা দেহ জানকি, তোমারে বলি আমি।
দুই পুত্র নিয়া আশ্রমে যাও তুমি॥

সীতা ও লবকুশকে আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়ে বাল্মীকি মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে সবাইকে পুর্নজীবন দান করলেন। জীবন পেয়ে রাম জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর, সেই ছেলে দুটি কে?

বাল্মীকি বললেন—এখন সে উভয়ের না পাবে দর্শন।
দেশে লৈয়া আমি দোঁহে করাব মিলন॥

রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন ঘোড়া নিয়ে দেশে ফিরলেন। এবার অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ হোল যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়ে বাল্মীকি লব কুশকে নিয়ে রাজসভায় এলেন। লব কুশ সেখানে রামায়ণ গান গাইলেন।

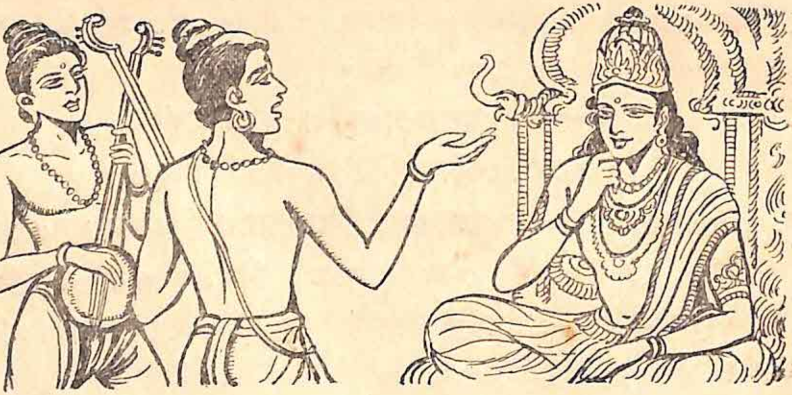
দুই ভাই গীত গায় বাজাইয়া বীণা।
সর্বলোকে গীত শুনে অমৃতের কণা॥
বীণা যন্ত্র বাজে, আর গীত গায় স্বরে।
শুনিয়া সকল লোক, আপনা পাসরে॥

এক মাসে রামায়ণ গান শেষ হোল। শ্রীরাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে লব কুশ বললেন—

না জানি পিতার নাম, মাতৃ-নাম সীতা।
বাল্মীকির শিষ্য মোরা, নাহি চিনি পিতা॥
এই পরিচয় পেয়ে শ্রীরঘুনন্দন।
দুই পুত্র কোলে করি করেন ক্রন্দন॥

রামচন্দ্র রথ পাঠালেন সীতাকে ফিরে নিয়ে যাবার জন্য। সীতা এলেন রাজসভায়। শ্রীরাম বললেন—

প্রথম পরীক্ষা দিলে সাগরের পার।
দেবগণ জানে তাহা, না জানে সংসার॥
পুনশ্চ পরীক্ষা দিবে সবাকার আগে।
দেখিয়া লোকের যেন চমৎকার লাগে॥



একথা শুনে সীতা বড়ই কষ্ট পেলেন। বললেন—

না দিব পরীক্ষা, প্রভু, ঘুচাব জঞ্জাল।
সংসারের সাধ নাহি, যাইব পাতাল॥
আজি হৈতে ঘুচুক, তোমার লাজ, দুখ।
আর যেন নাহি দেখ জানকীর মুখ॥

মা বসুন্ধরা তুমি দ্বিধা হও, তোমার ক্রোড়ে আমাকে আশ্রয় দাও! সহসা মাটি ফেটে গেল।—

অকস্মাৎ উঠিল সুবর্ণ সিংহাসন।
দশদিক আলো করে তাহার কিরণ॥
নানাবিধ বসন, ভূষণ পরিধান।
মূর্তিমতী পৃথিবী আইলা বিদ্যমান॥
ঝি বলিয়া পৃথিবী সীতারে ডাকে ঘনে।
কোলে করি সীতারে তুলিল সিংহাসনে॥
সবে দেখে, কারো নেত্রে না পড়ে নিমেষ।
সীতাদেবী করিলেন পাতাল প্রবেশ॥



লবকুশ কেঁদে উঠলেন। রামচন্দ্র কাঁদলেন। অযোধ্যার রাজপুরীতে ক্রন্দনের রোল উঠলো। যে সব প্রজা সীতার অপবাদ দিয়েছিল লজ্জায় তাদের মাথা হেঁট হোল।

অশ্বমেধ যজ্ঞ তো এই ভাবেই শেষ হোল। রামের মনে আর শান্তি নেই।

এই ভাবেই দিন যায়, একদিন তপস্বীর বেশে যমরাজ এলেন, বললেন—মহারাজ, তোমার সঙ্গে গোপনে কথা আছে। তবে—

এ সময়ে যে করিবে হেথা আগমন।
ব্রহ্মার বচনে তাঁরে করিবে বর্জন॥

দ্বারে লক্ষ্মণকে পাহারা রেখে রাম যমরাজাকে ঘরে নিয়ে গেলেন।

এমন সময় সহসা দুর্বাসা মুনি এসে উপস্থিত হলেন, বললেন—রামকে গিয়ে খবর দাও।

লক্ষ্মণ বললেন—এখন দেখা হবে না, কি করতে হবে বলুন, আমিই করি।

দুর্বাসা এই কথা শুনে ক্রুদ্ধ হলেন, বললেন—তুমি রামকে আমার আগমন সংবাদ দিবে কিনা বল, না হলে—

বালক, বণিতা, বৃদ্ধ করি আজি ধ্বংস।
দশরথ ভূপতিরে করিব নির্বংশ॥

বংশনাশ হওয়ার চেয়ে, একজনের মৃত্যুই শ্রেয়, কাজেই লক্ষ্মণ দুর্বাসাকে নিয়ে গেলেন রামের কাছে।

রাম যমরাজার কাছে সত্য করেছিলেন, সেই সত্য রাখতে গিয়ে লক্ষ্মণকে বর্জন করতে হোল। লক্ষ্মণ রামের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সরযূ নদীর জলে প্রাণ ত্যাগ করলেন।

সরযূর স্রোত বহে অতি খরসান।
লক্ষ্মণ নামিয়া স্রোতে ত্যজিলেন প্রাণ॥
হাহাকার রোদন উঠিল চতুর্দিক।
বিলাপ করেন রাম, কি কব অধিক॥
লক্ষ্মণের মরণে কাতর প্রাণ অতি।
ছত্র দণ্ড ধরিতে না চান রঘুপতি॥
ভরতে করিতে রাজা শ্রীরামের মন।
ভরত বিনয়ে কিছু কহেন বচন॥
এতকাল নানা সুখ ভুঞ্জিলাম রাম।
তব সঙ্গে যাইতে এখন মনস্কাম॥
ভরত করেন যদি এতেক উত্তর।
শত্রুঘ্নের পানেতে চাহেন রঘুবর।
শত্রুঘ্ন কহেন, প্রভু, তুমি মাত্র গতি।
স্বর্গধামে যাব মোরা তোমার সংহতি॥

রামচন্দ্র তখন চারি ভাইয়ের আট ছেলের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে দিলেন। কোশল রাজ্য দু'ভাগ করে দক্ষিণ দিকে কুশাবতী দিলেন কুশকে, আর উত্তরে শ্রাবন্তীপুরী দিলেন লবকে। লক্ষ্মণের দুই ছেলে, —চন্দ্রকেতুকে দিলেন অঙ্গদেশ আর অঙ্গদকে দিলেন মল্লদেশ। শত্রুঘ্নের দুই ছেলে,—শত্রুঘাতী ও সুবাহুকে মথুরাপুরী ভাগ করে দিলেন। তারপর রামচন্দ্র বিদায় নিলেন অযোধ্যা থেকে। ভরত ও শত্রুঘ্ন তাঁর অনুগমন করলেন।

অযোধ্যায় সাড়া পড়ে গেল। প্রজারা ছুটে এলো, কেঁদে বললো— তোমার মরণে, প্রভু, সবার মরণ।
তোমার জীবনে, রাম, সবার জীবন॥

তারা সব শ্রীরামের সঙ্গে সঙ্গে চললো—

হাতে লড়ি করিয়া যতেক খোঁড়া, কাণা।
শ্রীরামের সঙ্গে যায় নাহি শুনে মানা॥
স্থাবর জঙ্গম চলে শ্রীরামের সনে।
গাছে পক্ষী না রহে, না পশু রহে বনে॥

রাম, ভরত ও শত্রুঘ্ন এলেন সরযূর তীরে।—শ্রীরাম বিভীষণ ও হনুমানকে চিরজীবী হবার আশীর্বাদ করলেন, তারপর তিন ভাই সরযূর জলে দেহত্যাগ করলেন।—

সরযূর স্রোত বহে অতি খরসান।
স্রোতে নামি তিন ভাই ত্যজিলেন প্রাণ॥

চারিবেদ পঠিতে যতেক ফল হয়।
রাম নামে তার কোটিগুণ ফলোদয়॥
শ্রীরাম সীতার লীলা অমৃতের খণ্ড।
এত দূরে সমাপ্ত হইল সপ্তকাণ্ড॥





কাশীরাম দাস

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কৃত্তিবাস বাংলাভাষায় রামায়ণ লেখেন, কাশীরাম দাস লেখেন মহাভারত। কৃত্তিবাসী রামায়ণ যেমন ঠিক বাল্মীকির আদি রামায়ণের অনুবাদ নয়। কাশীরাম দাসের মহাভারতও ঠিক তেমনি ব্যাসদেবের আদি মহাভারতের হুবহু অনুবাদ নয়।

কাশীরাম দাস কবে জন্মেছিলেন তা ঠিক করে জানা যায় না। তখনকার দিনে লোকেরা কাব্যের আদর করতো, কবি কেমন মানুষ, কোথাকার লোক সে হিসাব কেউ রাখতো না, কবিও নিজেকে আড়ালে রাখতেই ভালবাসতেন। তবে এক-আধটু বংশ পরিচয় বা জীবনের কোন বিশেষ ঘটনা কবি কখনো-কখনো উল্লেখ করতেন তাঁর কাব্যের মধ্যে। কাশীরামদাসও নিজের পরিচয় দিয়ে গেছেন তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে—

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গি গ্রাম।
প্রিয়ঙ্করদাস-পুত্র সুধাকর নাম॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত, কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥
পাঁচালী প্রকাশি কহে কাশীরামদাস।
অলি হব কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ॥

এই পরিচয় থেকে জানা যায় সেই সময় বর্ধমান জেলার উত্তর দিকে ইন্দ্রানী নামে একটি পরগণা ছিল। সেখানে ব্রাহ্মণী নদীর তীরে সিঙ্গি গ্রামে কবির জন্ম হয়। সিঙ্গি একখানি বড় গ্রাম। এখন কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত, দাঁইহাট ষ্টেশনের কাছে; কাশীরাম দাস জাতিতে ছিলেন কায়স্থ। পিতার নাম কমলাকান্ত, পিতামহের নাম সুধাকর, প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্করদাস। কবিরা তিন ভাই, কৃষ্ণদাস জ্যেষ্ঠ, মধ্যম কাশীরামদাস, কনিষ্ঠ গদাধরদাস।

কাশীরামদাসের দুই ভাইও কবি ছিলেন, তাঁরাও লিখতেন। কিন্তু কাশীরামদাসের মত প্রতিভা তাঁদের ছিল না, সেই জন্য কাশীরামের মত তাঁরা জনপ্রিয় হতে পারেন নি।

শোনা যায় কাশীরাম দাস মেদিনীপুরে গিয়াছিলেন। সেখানে আওসগড়ের রাজার আশ্রয়ে তিনি থাকতেন এবং শিক্ষকতা করতেন।

মহাভারত ছাড়াও কাশীরাম আরো তিনখানি কাব্য রচনা করেন—স্বপ্নপর্ব, জলপর্ব ও নলোপাখ্যান। এই কাব্যগুলিতে তাঁর প্রতিভা পূর্ণরূপে ফুটে ওঠে নি। সম্ভবতঃ সেগুলি তাঁর প্রথম জীবনের রচনা। তাঁর এই কবিত্ব শক্তি দেখেই বোধ হয় আওসগড়ের রাজা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ'ন এবং তাঁকে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত করেন।

আওসগড়ের রাজবাড়ীতে কথকতা হোত, পুরাণ পাঠ হোত। কবি কাশীরামদাস বসে বসে নিবিষ্টমনে সব শুনতেন। মহাভারতের পাঠ শুনতে তাঁর ভাল লাগতো। একমনে শুনতে শুনতে সহসা একদিন তাঁর মনে হোল,—মহাভারতের পূর্ণ অনুবাদ তো একখানিও নেই, কৃত্তিবাস যেমন রামায়ণ করেছেন, তিনিও তেমনি একখানি বাংলা মহাভারত করবেন। সেইদিন থেকেই তিনি লিখতে সুরু করলেন।

কাশীরামদাস ব্যাসদেবের সংস্কৃত বইখানি আগাগোড়া অনুবাদ করলেন বটে তবে সেটা গল্পের ভাবানুবাদ। ভাষা, ছন্দ ও বর্ণনা কাশীরামদাস নিজের মনের মত করে লিখলেন। তাঁর আগে যে সব কবিরা মহাভারতের কোন কোন পর্ব বা আখ্যান লিখে খ্যাতি লাভ করেছিলেন তাঁদের সেইসব লেখার যে যে অংশ ভালো লাগে কাশীরাম সেই সেই অংশের ভাব গ্রহণ করতেন। পুরাণ থেকেও তিনি কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করলেন। তার উপর বাংলা দেশে তখন চৈতন্যদেবের যুগ, পদাবলী সাহিত্য ও বৈষ্ণব কাব্যগুলি দেশের বুকে কৃষ্ণভক্তির প্লাবন এনে দিয়েছে। কাশীরামদাসের লেখার মধ্যেও এই কৃষ্ণভক্তি রীতিমতই প্রকাশ পেয়েছে।

মহাভারত বিরাট গ্রন্থ। অনেকে বলেন কাশীরামদাস মহাভারতের সম্পূর্ণ অনুবাদ করে যেতে পারেন নি। তিনি আদিপর্ব, সভাপর্ব, বনপর্ব শেষ করে বিরাটপর্বের কিছুটা লিখে মারা যান। বাকীটুকু তাঁর ভাই ও পুত্র শেষ করেন। কাশীরামের পুত্র নন্দরামেরও পিতার মত কবিত্ব শক্তি ছিল।—

আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর॥

তবে সম্পূর্ণ মহাভারতখানিই যখন কাশীরামের নামেই আমরা পাচ্ছি তখন পুরো বইখানিই কাশীরামের রচনা বলে আমরা মেনে নেব।

পণ্ডিতেরা অনেক খোঁজ-খবর নিয়ে বলেন যে কাশীরামদাস ছিলেন সাড়ে তিন-শো বছর আগেকার লোক। তিনি জন্মেছিলেন খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি এবং সপ্তদশ শতকের প্রথমে মানবলীলা সংবরণ করেন। বাংলা কাব্যের দুটি যুগের মাঝে তার স্থান। তাঁর পূর্ববর্তী কবিরা অন্তরের ভাব প্রকাশ করে গেছেন সরল অনাড়ম্বর ভাবে এবং তাঁর পরবর্তী কবিরা যা-কিছু লেখেন সবই মার্জিত ভাষায়, অলঙ্কার উপমা প্রভৃতি প্রয়োগ করে। কাশীরামদাসের লেখার মধ্যে এই দুটি ধারারই সমন্বয় ঘটেছে—কখনো উপমা, অলঙ্কার ও ভাষার ঝংকার আবার কখনো-বা সরল অনাড়ম্বর ভাবের মাধুর্য।

অর্জুনের লক্ষ্যভেদে কবি ভাষার ঝংকার দেখিয়েছেন ঃ

দেখ দ্বিজ মনসিজ, জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র, পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম তনুশ্যাম, নীলোৎপল আভা।
মুখ রুচি কত শুচি, করিয়াছে শোভা॥

সিংহগ্রীব বন্ধুজীব, অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু যুগ্মভুরু, ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ, মত্ত করিবর॥
ভুজ যুগে নিন্দে নাগে, আজানুলম্বিত।
করিকর যুগবর, জানু সুবলিত॥
বুকপাটা দন্তছটা, জিনিয়া দামিনী।
দেখি এরে, ধৈর্য ধরে, নহেক কামিনী॥
মহাবীর্য যেন সূর্য জলদে আবৃত।
অগ্নি অংশু যেন পাংশু জালে আচ্ছাদিত॥
বিষ্কিবেক লক্ষ্য এই লয় মোর মনে।
ইথে কি সংশয় আর কাশীদাস ভণে॥

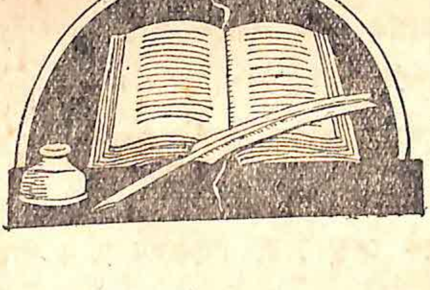
আবার বক রাক্ষস বধের সময় কবি কত সরলভাবে লিখছেন ঃ

শিলাবৃষ্টি করে দোঁহে দোহার উপর।
বাহু বাহু যুদ্ধ হৈল অতি ভয়ঙ্কর॥
মুণ্ডে মুণ্ডে বুকে বুকে ভুজে ভুজে তাড়ি।
ধরাধরি করে দোঁহে যায় গড়াগড়ি॥
যুদ্ধেতে হইল শান্ত বক নিশাচর।
রাক্ষসে ধরিল বীর কুন্তীর কোঙর॥
বাম হস্তে দুই জানু ডান হস্তে শির।
বুকে জানু দিয়া টানিলেন ভীম বীর।
মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গিয়া করেন দুইখান।
মহাশব্দ করি বীর ত্যজিল পরাণ॥

আর যত আছিল বকের অনুচর।
ভয়ে পলাইয়া সবে গেল বনান্তর॥

বিরাট মহাকাব্যকে এমন সুন্দর ভাবে লেখা মোটেই সহজ-সাধ্য নয়। কাশীরাম দাসের এই অসাধ্য সাধন করার শক্তি ছিল, আর তার সঙ্গে ছিল অসামান্য প্রতিভা, যার জন্য কাশীরামের মহাভারত বাংলার ঘরে ঘরে স্থান পেয়েছে,—সাড়ে-তিনশো বছর পরে আজও এই মহাকাব্য বাঙ্গালী সাগ্রহে পড়ে ও পাঠ শুনে। সার্থক হয়েছিল কবির ভণিতা লেখা—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥



ছোটদের—

কাশীদাসী মহাভারত

আদিপর্ব

অনেক অনেক দিন আগে দিল্লীর কাছে হস্তিনাপুর নামে এক রাজ্য ছিল। সেখানে রাজা ছিলেন বিচিত্রবীর্য।

চন্দ্রের ছেলে বুধ, বুধের ছেলে পুরুরবা, তাঁর ছেলে যযাতি, যযাতির ছেলে পুরু। পুরুর বংশে জন্মগ্রহণ করেন দুষ্মন্ত, তিনি শকুন্তলাকে বিয়ে করেন। তাঁদের ছেলে ভরত।—

ভরত নামেতে তাঁর হইল নন্দন।
যাঁর রাজ্য এ ভারত খ্যাত ত্রিভুবন॥
জন্মিলা ভরত কুলে হস্তী নৃপবর।
স্থাপন করিলা যিনি হস্তিনা নগর॥
হস্তীর বংশেতে হইল কুরু মহাশয়।
যাঁর নামে কুরুক্ষেত্র ঘোষে বিশ্বময়॥
অবশেষে জন্মিলেন শান্তনু নৃপতি।
তার ইতিহাস কিছু বর্ণিব সম্প্রতি॥

কুরুকুলের রাজা ছিলেন শান্তনু।

জাহ্নবীর তটে কভু ভ্রমে রাজা একা।
পাইল দৈবাৎ তথা জাহ্নবীর দেখা॥

রাজার ভারী পছন্দ হোল, তিনি তাঁকেই রাণী করলেন। কিন্তু

রাণীর কাছে রাজাকে প্রতিজ্ঞা করতে হোল—রাণী যা করবেন রাজা কিছু বলতে পাবেন না।

আপন ইচ্ছায় আমি করিব যে কাজ।
আমারে নিষেধ না করিবা মহারাজ॥
যেদিন বলিবে মোরে কোন কুবচন।
সেদিন হইতে নাহি পাবে দরশন॥

রাজা বললেন—যে কিছু তোমার ইচ্ছা কর নিজ সুখে।
কখন নিষেধ বাক্য না আনিব মুখে॥

এদিকে কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা পালন করা রাজার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠলো। রাণীর এক একটি পুত্র জন্মায় আর রাণী তাদের জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসেন—

এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, ছয়, সাত।
একে, একে গঙ্গাদেবী করিল নিপাত॥

অষ্টম পুত্রকেও জন্মাবার পর যখন গঙ্গাদেবী তাকে জলে ভাসাতে যাচ্ছেন, তখন রাজা আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, রাণীর কোল থেকে ছেলেকে কেড়ে নিলেন। রাণী বললেন—বেশ,—

তোমায় আমায় আর নাহি দরশন।
এ পুত্র পালিহ, রাজা, করিয়া যতন॥

—মনে রেখো, এ পুত্র যে-সে লোক নয়, স্বর্গের অষ্ট বসুদের একজন। বশিষ্ঠের আশ্রম থেকে বসুরা কামধেনু চুরি করেছিল, সেই কারণে বশিষ্ঠ মুনি তাঁদের অভিশাপ দেন, সেই অভিশাপেই তারা পৃথিবীতে জন্মেছিলেন, সাতজনের মুক্তি হয়ে গেছে, ইনি অষ্টম বসু। এই বসুগণের প্রতি দয়া করে আমি এঁদের মা হয়ে এসেছিলাম, আমি গঙ্গা।—

আমা হৈতে পাইলে যে অষ্টম কুমার।
দেবব্রত নাম এই তনয় তোমার॥

ক্রমে পুত্র বড় হোল, বশিষ্টের কাছে বিদ্যা শিক্ষা করলো, তারপর শান্তনু একদিন তাঁকে যুবরাজ করলেন।

দিন যায়, একদিন শান্তনু যমুনার তীরে মৃগয়া করতে গেছেন, সহসা চারিদিক সুগন্ধে ভরে গেল। কোথা থেকে এতো সুগন্ধ আসছে, খুঁজতে খুঁজতে রাজা দেখেন একটি মেয়ে নদীতে নৌকা বাইছে, এ সুগন্ধ তারই দেহ থেকে বেরুচ্ছে।—

কন্যা বলে, আমি দাস-রাজার দুহিতা।
ধর্মার্থে বাহি যে নৌকা আজ্ঞা দিল পিতা॥

শান্তনুর ভারী ভালো লাগলো মেয়েটিকে, তার বাপের কাছে গিয়ে বললেন—এই কন্যা আমাকে দান কর, আমি রাণী করবো।

দাস রাজা বললেন—ভালো কথা, কিন্তু আপনি প্রতিজ্ঞা করুন—

আমার কন্যার যেই হইবে কুমার।
সেই জনে দিবে তুমি রাজ্য অধিকার॥
রাজা বলে, হেন কর্ম করিতে কি পারি।
দেবব্রত পুত্র মোর রাজ্য-অধিকারী॥

দাস-রাজা বললেন—তাহলে আমি কন্যা দান করতে পার্‌বো না।

শান্তনু ফিরে এলেন, তার মন খারাপ হয়ে গেল। দেবব্রত মন্ত্রীর মুখে এই সংবাদ পেয়ে তখনই ছুটে গেলেন সেই দাস-রাজার কাছে, বললেন—

পিতার বিবাহ হেতু করি অঙ্গীকার।
আজি হৈতে রাজ্যে মম নাহি অধিকার॥
তোমার কন্যার গর্ভে যে হবে কুমার।
হস্তিনা নগরে তার হবে রাজ্য ভার॥

দাস রাজা বললেন—তুমি না হয় প্রতিজ্ঞা করলে কিন্তু তোমার পুত্র যদি রাজ্য নিয়ে বিবাদ করে ?

দেবব্রত বললেন—তোমার অগ্রেতে আমি করি অঙ্গীকার।
বিবাহ না করিব যে প্রতিজ্ঞা আমার॥

এই কঠিন প্রতিজ্ঞার জন্য সেদিন থেকে দেবব্রতের নাম হোল ভীষ্ম।—

ধন্য ধন্য বলিয়া ডাকয়ে সর্বজনে।
ভীষ্ম, ভীষ্ম বলি রব হইল ভুবনে॥

কৈবর্ত্য-রাজের কন্যা-দানে আর কোন বাধা রইল না। ধীবর-কন্যা সত্যবতীর সঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজা শান্তনুর বিয়ে হয়ে গেল।

এই সত্যবতীর দুই পুত্র হয়—চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য।

চিত্রাঙ্গদ রাজা হলেন, কিন্তু এক মায়াবী গন্ধর্বের হাতে তিনি নিহত হলেন। তখন ছোট ভাই বিচিত্রবীর্য রাজা হলেন।

বিচিত্রবীর্য কাশীরাজের দুই কন্যাকে বিয়ে করেন অম্বিকা ও অম্বালিকা। রাণী অম্বিকার পুত্র ধৃতরাষ্ট্র আর অম্বালিকার পুত্র পাণ্ডু।

বিচিত্রবীর্যও অকালেই মারা যান। ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুকে মানুষ করে তোলেন।

বিচিত্রবীর্যের দুই ছেলে—ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন জন্ম থেকেই অন্ধ। অন্ধ রাজ্য পায় না, তাই ছোট ভাই পাণ্ডু হলেন রাজা।

ধৃতরাষ্ট্রের একশো ছেলে ও একটি মেয়ে। তাদের মধ্যে বড় ছিল দুর্যোধন, তারপর দুঃশাসন ও আরো আটানব্বুই জন। আর পাণ্ডুর ছেলে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেব। এক একজন দেবতার আশীর্বাদে পাণ্ডুর এক একটি পুত্র জন্মেছিল, ধর্মের আশীর্বাদে যুধিষ্ঠির, পবনের আশীর্বাদে ভীম, ইন্দ্রের আশীর্বাদে অর্জুন, অশ্বিনী-কুমার দু'জনের আশীর্বাদে নকুল ও সহদেব।

কথা ছিল বংশের বড় ছেলে রাজা হবে, যুধিষ্ঠির ছিলেন বড়, তাঁর রাজ্য পাবার কথা, সেইজন্য দুর্যোধনেরা একশো ভাই পাণ্ডবদের পাঁচ ভাইয়ের হিংসা করতো।

রাজপুরীতে একশো-পাঁচ ভাই একসঙ্গেই থাকতো।

কৌরব, পাণ্ডব ভাই পঞ্চোত্তর শত।
বেদ শাস্ত্র অধ্যয়নে সবে পারগত॥
বালকের ক্রীড়া যত অদেয় সংসারে।
তাহাতে উত্তম সবে, সদা ক্রীড়া করে॥
ক্রীড়ারসে বলে শ্রেষ্ঠ পঞ্চ সহোদর।
সবার অধিক বলে বীর বৃকোদর॥
বালক কালেতে ভীম মহাপরাক্রম।
ভীমেরে বালকগণ দেখে যেন যম॥

সব ভাই একসঙ্গে মিলেও ভীমের সঙ্গে পেরে ওঠে না।

দুই হস্তে ধরি বীর সবাকার কর।
চক্রাকার করিয়া ভ্রময়ে বৃকোদর॥
প্রাণ যায়, যায় বলি পরিত্রাহি ডাকে।
মৃতকল্প দেখি সবে তবে ভীম রাখে॥
জলমধ্যে ক্রীড়া করে সব ভ্রাতৃগণ।
একবারে ধরে ভীম দশ, বিশ জন॥
জলের ভিতরে ডুবে চাপি দুই কাঁখে।
মৃতকল্প করি ছাড়ে প্রাণ মাত্র রাখে॥
ফল হেতু উঠে সবে বৃক্ষের উপরে।
তলে থাকি বৃক্ষে ভীম চরণ প্রহারে॥

চরণের ঘায় বৃক্ষ করে থর, থর।
ফল সহ ভূমে পড়ে সব সহোদর॥

দুর্যোধন ভাবলো—বয়স বাড়লে ভীম তো আরো শক্তিমান হবে, এখনই যদি ওকে মেরে ফেলি তাহলে পরে চার ভাইকে বেঁধে আমি রাজা হতে পারবো। দুর্যোধন ভাইদের ডেকে বললেন—চল গঙ্গা-স্নানে যাই।

প্রমাণকোটি গঙ্গার ধারে। যেখানকার বাগান বাড়ীতে জলযোগ করে গঙ্গাস্নানে যাওয়া হবে।

একত্র হইয়া সবে আহারে বসিল।
নানা দ্রব্য উপহার খাইতে লাগিল॥
উপহার পূরি করে অঞ্জলি, অঞ্জলি।
একজন মুখে দেয় আর জন তুলি॥
খলমতি দুর্যোধন বিচারিয়া মনে।
কালকূট দিল দুষ্ট ভীমের বদনে॥
পুনঃ পুনঃ যত্ন করি দিল উপহার।
ভক্ষণে সন্তুষ্ট ভীম আনন্দ অপার॥

তারপর সবাই জলে গিয়ে নামলেন। স্নান শেষ করে যখন সবাই উঠলেন তখন ভীমের শরীরে বিষের কাজ সুরু হয়েছে। ভীম তাড়াতাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়লেন। ক্রমে ভীম জ্ঞান হারালেন। দুর্যোধন তৈরী ছিল।

অচেতন ভীমেরে দেখিয়া কুরুপতি।
হস্তপদ বন্ধন করিল শীঘ্রগতি॥
ধরিয়া ফেলিল তবে গঙ্গার সলিলে।
নাহিক শরীরে জ্ঞান, জারিত গরলে॥

ভাসিয়া ভাসিয়া ক্রমে নাগের ভবনে।
উপনীত হৈল ভীম ঘোর অচেতনে॥
বিপুল শরীর দেখি বেড়ে নাগগণ।
ক্রোধে চতুর্দিক সব করয়ে দংশন॥

ভীমকে যে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল সাপের বিষই ছিল তার ঔষধ। ভীমের বিষ কেটে গেল। জ্ঞান হোল। বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে হাতের কাছে যত সাপ পেল, সব কটাকে ভীম মেরে ফেললো।

দুই চারি নাগ তবে একত্র হইয়া।
সকল বৃত্তান্ত কহে বাসুকীরে গিয়া॥

শুনেই নাগরাজ বাসুকী ছুটে এলেন, ভীমকে দেখেই বাসুকী চিনতে পারলেন, বললেন—আমার নাতির নাতি, হও, বৃকোদর।

কি করিব তব, প্রিয়, করহ উত্তর॥

বাসুকী ভীমকে আদর করে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়ীতে। খেতে দিলেন অমৃত। অমৃত খেয়ে ভীম পুরো আটদিন ঘুমালো।

হেথা নাগলোকে নিদ্রা যায় বৃকোদর।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল অষ্ট দিবস অন্তর॥
ভীমে সচেতন দেখি বলে নাগগণ।
আপন আলয়ে তুমি করহ গমন॥

এদিকে যুধিষ্ঠির ভীমকে দেখতে না পেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরলেন, কুন্তীকে জিজ্ঞাসা করলেন—মা, ভীম কি বাড়ী এসেছে?

কুন্তী তখনই বিদুরের কাছে খবর দিলেন, বিদুর যুধিষ্ঠিরের কাকা, সব শুনে তিনি বললেন—

দুষ্ট দুর্যোধন তারে দেখিতে না পারে।
ক্রূরমতি নির্লজ্জ যে মারিয়াছে তারে॥

এত শুনি কুন্তীদেবী করেন রোদন।
ভূমে গড়াগড়ি যায় ভাই চারিজন॥

এমন সময় ভীম ফিরলেন। মা-ভাইকে ভীম সব কথা বললেন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, ভাই চারিজনে।
এই সব কথা যেন কেহ নাহি শুনে॥
দুর্যোধন দুষ্ট কেহ না যাবে বিশ্বাস।
একা হৈয়া কেহ নাহি যাবে তার পাশ॥
হেনমতে বিচার করিয়া পঞ্চজন।
সেই হৈতে বাল্য ক্রীড়া করিলা বর্জন॥

তারপর সুরু হোল ধনুর্বিদ্যা শেখা। গুরু হলেন কৃপাচার্য।

পঞ্চোত্তর শত ভাই কৌরব, পাণ্ডব।
কৃপাচার্য ধনুর্বেদ শিখাইল সব॥

একদিন বিকালে লোহার একটি ভাঁটা নিয়ে খেলতে খেলতে ভাঁটাটি গড়িয়ে পড়ে গেল একটি কূয়ার মধ্যে। খেলা বন্ধ হোল, কি করে কূয়ার মধ্যে থেকে তারা ভাঁটা তুলবে—এই হোল সমস্যা। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ সেখানে এলেন, এবং ভাঁটাটি তীর মেরে কূয়া থেকে তুলে দিলেন। ছেলেরা খুশী হোল, বাড়ী গিয়ে ঠাকুরদা ভীষ্মের কাছে সব কথা বললো। ভীষ্ম সব শুনেই বুঝলেন যে তিনি অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য। তাঁকে তখনই রাজকুমারদের অস্ত্র শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করলেন।

দ্রোণাচার্য কম লোক ছিলেন না। তিনি ভরদ্বাজ মুনির পুত্র, দ্রোণ অর্থাৎ কলসীর মধ্যে জন্মেছিলেন বলে তাঁর নাম দ্রোণাচার্য। পরশুরামের কাছে তিনি অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিলেন। কৃপাচার্যের ভগিনী গৌতমীকে তিনি বিবাহ করেন। অশ্বত্থামা নামে তাঁর এক পুত্র হয়।

দ্রোণ ছিলেন বড়ই গরীব। ছেলেকে দুধ কিনে খাওয়াতে পারতেন না, একদিন অশ্বত্থামা দুধ খাবার জন্য কাঁদাকাটা সুরু করলো।

আচম্বিতে একদিন আইল ধাইয়া।
আমার অগ্রেতে কহে কান্দিয়া কান্দিয়া॥
গবীদুগ্ধ পান করে সকল বালক।
সেইমত দুগ্ধ দেহ আমারে জনক॥

দুধের অভাবে পিটালি গোলা জল খাইয়ে দ্রোণ ছেলের কান্না থামালেন।

পিটালির জল সবে দুগ্ধ বলি দিল।
আনন্দিত হৈয়া শিশু তাহা পান কৈল॥

কিন্তু অন্য ছেলেরা তা শুনে ঠাট্টা করলো।

দ্রোণাচার্যের মনে বড় কষ্ট হোল। অনেক আশা নিয়ে তিনি ছেলেবেলাকার বন্ধু দ্রুপদ রাজার কাছে গেলেন। কিন্তু দ্রুপদ রাজা তাঁকে চিনতে পারলো না।

কোথায় দরিদ্র তুমি, আমি নৃপমণি।
তব সঙ্গে সখ্য কভু আমি নাহি জানি॥

দ্রোণ অপমান বোধ করলেন, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন—এর শোধ নেবেন।

হস্তিনায় এসে দ্রোণাচার্য এবার একশো পাঁচ ভাইয়ের গুরু হলেন, শিষ্যদের বললেন—

অস্ত্রবিদ্যা সবারে করিব অধ্যাপন।
শিক্ষা করি মম বাক্য করিবা পালন॥
আমার যে বাঞ্ছা আছে শুন সব শিষ্য!
সত্য কর, তোমরা তা করিবা অবশ্য॥

সকলে চুপ করে রইল, শুধু অর্জুন সাড়া দিল।

অর্জুন বলেন, করি সত্য অঙ্গীকার।
করিব পালন, হয় যে আজ্ঞা তোমার॥
একান্তে বলেন দ্রোণ করি অঙ্গীকার।
শিষ্য না করিব কারে সদৃশ তোমার॥

দ্রোণাচার্য রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষা দিতে সুরু করলেন—

তবে দ্রোণাচার্য লৈয়া যত শিষ্যগণ।
সর্বদা করান নানা অস্ত্র অধ্যাপন॥
অহর্নিশি পার্থের নাহিক অবসর।
নাহি নিদ্রা, সদা শ্রম, হাতে ধনুঃশর॥
পার্থের সৌজন্য দেখি গুরু বড় প্রীত।
বহুবিদ্যা অর্জুনে দিলেন অপ্রমিত॥

বিদ্যা শেষ হলে দ্রোণ ছেলেদের পরীক্ষা করতে চাইলেন।

তবে কতদিনে দ্রোণ বিদ্যা পরীক্ষিতে।
কাষ্ঠেতে রচিয়া পক্ষী রাখেন বৃক্ষেতে॥

বললেন—আমি বলা মাত্রই তীর মেরে ওই পাখীর মাথা কেটে ফেলতে হবে, তোমরা প্রস্তুত হও।

সকলের আগে ডাক পড়লো যুধিষ্ঠিরের। দ্রোণ জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি দেখছ?

ধর্ম বলিলেন, ভাস দেখি বৃক্ষোপর।
ভূমিতে তোমারে দেখি আর সহোদর॥

দ্রোণ বললেন—তুমি পারবে না।

দুর্যোধন শত ভাই, বীর বৃকোদর।
একে একে সবারে দিলেন ধনুঃশর॥

যেইরূপ কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
সেই মত কহিল সকল ভ্রাতৃগণ॥

সবার শেষে এলেন অর্জুন। দ্রোণ জিজ্ঞাসা করলেন—কি দেখছ?

অর্জুন বলেন আমি অন্য নাহি দেখি।
বৃক্ষমধ্যে সবে দেখিবারে পাই পাখী॥

দ্রোণ বলিলেন—সমস্ত পাখীটা দেখতে পাচ্ছ?

অর্জুন বলেন, আর ভাস নাহি দেখি।
কেবল দেখি যে মুণ্ড সহ দুই আঁখি॥
দ্রোণ বলিলেন, অস্ত্রে কাট পক্ষিশির।
না স্ফুরিতে বাক্য মাত্র কাটে পার্থবীর॥

দ্রোণ সন্তুষ্ট হলেন।

আরেক দিনের কথা। দ্রোণ নদীতে স্নান করতে গেছেন। জলে নামামাত্র দ্রোণকে কুমীরে ধরলো। দ্রোণ কুমীরকে তখনই মারতে পারতেন কিন্তু রাজকুমারদের পরীক্ষা করার জন্য বললেন—

আমারে কুম্ভীরে লইয়া যায় জলে।
এই ডুবাইল, রাখ আমারে সকলে॥

অন্যান্য ছেলেরা কি করবে তা ঠিক করার আগেই অর্জুন পাঁচ বাণ মেরে কুমীরকে খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন। দ্রোণ সন্তুষ্ট হলেন।

তুষিয়া দিলেন অস্ত্র নাম ব্রহ্মশির।
অস্ত্র দিয়া বলিলেন দ্রোণ মহাবীর।
এই অস্ত্র প্রহারিবা দেবতা রাক্ষসে।
কদাচিত অস্ত্র নাহি ছাড়িবা মানুষে॥

এইভাবেই রাজকুমারদের অস্ত্র শিক্ষা শেষ হোল।

দ্রোণ রাজসভায় এসে বললেন—

বিদ্যায় পারগ হৈল যতেক কুমার।
সাক্ষাতে পরীক্ষা কর বিদ্যা সবাকার॥

ধৃতরাষ্ট্র খুসী হয়ে তখনই সভামণ্ডপ তৈরী করার আদেশ দিলেন।

শুভদিন করিয়া চলিল সর্বজন।
কৃপাচার্য, ধৃতরাষ্ট্র, গঙ্গার নন্দন॥
গান্ধারী, সুবলসুতা, কুন্তী আদি করি।
আইল সকল যত অন্তঃপুর নারী॥
রথ-গজ-অশ্ব-পৃষ্ঠে মঞ্চের উপরে।
লক্ষপুর করিয়া বসিল দেখিবারে॥
নানাবাদ্য বাজে, শব্দে কর্ণে লাগে তালি।
প্রলয়কালেতে যেন সিন্ধু কলকলি॥
হেনকালে আইল আচার্য মহাশয়।
তারা মধ্যে হৈল যেন চন্দ্রের উদয়॥
সভাতে প্রবেশ করিলেন যুধিষ্ঠির।
বিকচ-পঙ্কজ-মুখ, নির্মল শরীর॥

তারপর এলেন ভীম ও দুর্যোধন।—

গদা হাতে এল তবে দুই মহাবীর।
মল্লবেশে, রঙ্গমাটি ভূষিত শরীর॥
তবে আজ্ঞা করিল গুরু অর্জুনে আসিতে।
আইলেন ধনঞ্জয় ধনুঃশর হাতে॥
নব জলধর প্রায় অঙ্গের বরণ।
পূর্ণ শশধর মুখ, রাজীব লোচন॥

সকলেই নিজের বিদ্যা দেখাচ্ছেন, চারিদিকে ধন্য ধন্য রব উঠেছে। ধৃতরাষ্ট্র দেখতে পাচ্ছেন না। বিদুরের মুখ থেকে সব শুনছেন।—

ধৃতরাষ্ট্র শুনি প্রশংসিলেন বিস্তর।
কুরুবংশে, ভাগ্যে-মম এমন কোঙর॥

সহসা রঙ্গভূমিতে আগুয়ান হলেন কর্ণ।

শতকুম্ভ যিনি তাঁর অঙ্গের বরণ।
শ্রবণ পরশে দিব্য পঙ্কজ-নয়ন॥
শ্রবণে কুণ্ডল যুগ দীপ্ত দিনকর।
অভেদ্য কবচে আবরিত কলেবর॥
দুইদিকে দুই তূণ, বামে ধরে ধনু।
অজানুলম্বিত ভুজ আনন্দিত তনু॥

অর্জুনকে কর্ণ বললেন—

যতেক করিলা তুমি সভার ভিতর।
তাহা হৈতে বিদ্যা আমি জানি বহুতর॥
অর্জুন বলিল, তোরে কে ডাকিল হেথা।
কে বলিল সভাতে কহিতে হেন কথা॥

কর্ণ বললেন—হীনলোক প্রায় কেন দেহ গালাগালি।

অস্ত্রে অস্ত্রে দ্বন্দ্ব কর, তবে জানি বলী॥

এমন সময় কৃপাচার্য বললেন—রাজার ছেলে রাজপুত্রের সঙ্গে লড়াই করবে, তোমার বংশ পরিচয় কি?

শুনিয়া কৃপের মুখে এতেক বচন।
হেঁটমুণ্ড হৈল বীর বিরস বদন॥

দুর্যোধন বললেন—বেশ, রাজা হলেই তো যুদ্ধ করা চলবে! আমি এখনই কর্ণকে অঙ্গদেশের রাজা করে দিচ্ছি।

দুর্যোধন সেইখানেই কর্ণকে রাজ্যে অভিষেক করলেন।

অভিষেক দ্রব্য আনাইল ততক্ষণে।
বসাইল কর্ণবীরে কনক-আসনে॥
শিরেতে ধরিল ছত্র রতনে মণ্ডিত।
রাজগণ চামর ঢুলায় চারিভিত॥

কর্ণ চিরদিনের মত দুর্যোধনের বন্ধু হয়ে গেলেন। সারথি অধিরথ খবর পেয়ে ছুটে এলেন।

কর্ণ প্রণমিল অধিরথের চরণে।
দেখিয়া বিস্ময় মানিলেন সভাজনে॥

সবাই জানলো কর্ণ সারথি অধিরথের ছেলে। ভীম উপহাস করে বললেন—সভাতে করহ কার্য নিজ জাতি মত।

হাতেতে প্রবোধ-বাড়ি চালা গিয়া রথ॥

দুর্যোধন তার জবাব দিলেন—

সখা করিলাম কর্ণে সভার ভিতর।
একথা কহিতে যোগ্য নহ বৃকোদর॥

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল, সভা শেষ হোল।

অস্ত গেল দিনকর রজনী প্রবেশ।
রাজগণ চলি গেল যার যেই দেশ॥
কর্ণ-হস্ত ধরিয়া চলিল দুর্যোধন।
সঙ্গেতে চলিল ভাই একশত জন॥

শিক্ষা শেষে গুরুকে দক্ষিণা দিতে হয়। এবার দ্রোণাচার্য দক্ষিণা চাইলেন।

দ্রোণ বলিলেন শুন, পার্থ দুর্যোধন।
রত্ন আদি ধনে মম নাহি প্রয়োজন॥

পাঞ্চাল-ঈশ্বর খ্যাত দ্রুপদ ভূপতি।
রণ মধ্যে তারে আন বান্ধিয়া সম্প্রতি॥

তখনই সকলে পাঞ্চালরাজ্য আক্রমণ করলো। রীতিমত লড়াই সুরু হয়ে গেল। অর্জুনের হাতে দ্রুপদ বন্দী হোন, দুর্যোধন তার হাত-পা বেঁধে নিয়ে এলো দ্রোণের কাছে। দ্রোণ বললেন—

বলি যে, দ্রুপদ, তোর সৈন্য গেল কোথা।
কোথা তোর প্রজাগণ, নবদণ্ড ছাতা॥
পূর্বের বচন, সখা, হয়কি স্মরণ।
সেবকে বলিলা দিতে একটি ভোজন॥
এখন সমান হইলাম দুইজন।
এবে সখা বলিবা কি আমারে রাজন॥
বাল্যকালে করিয়াছিলা যে অঙ্গীকার।
আমি রাজা হৈলে রাজ অর্ধেক তোমার॥
পালিতে নারিলা তুমি আপন বচন।
এবে সব রাজ্য হৈল আমার শাসন॥
তুমি না পালিলা, আমি চাহি পালিবারে।
অর্ধেক পাঞ্চাল রাজ্য দিলাম তোমারে॥
গঙ্গার দক্ষিণ তীরে তব অধিকার।
উত্তর তটের রাজ্য সকলি আমার॥
অর্ধ, অর্ধ রাজ্য এই দোঁহার সমান।
পুনঃ সখা হও, মোরে হও স্নেহবান॥

দ্রুপদ আর কি বলবেন, সবটুকু রাজ্যই গিয়েছিল, তবু তো অর্ধেক ফিরে পাওয়া গেল! মুখে দ্রোণকে ধন্যবাদ দিলেন, মনে কিন্তু রাগ রহিল।

কুরুবংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠির। ধৃতরাষ্ট্র তাঁকেই যুবরাজ করলেন। পাঁচ ভাই মিলে তখন রাজ্য অনেক বাড়িয়ে ফেললেন।—

জিনিল অনেক দেশ, কত লব নাম।
বহু রাজা সহ হৈল অনেক সংগ্রাম॥
উত্তম পশ্চিম পূর্ব জম্বুদ্বীপ আদি।
জিনিয়া আনিল দোঁহে বহুরত্ন নিধি॥
কুরুকুল-ক্রমে যাহা অসাধ্য আছিল।
ভীমার্জুন দোঁহে তাহা আয়ত্ত করিল॥

ধৃতরাষ্ট্র এতটা সইতে পারলেন না।—

মম পুত্রগণ-গুণ কেহ নাহি বলে।
পাণ্ডবের যশ প্রচারিল ভূমণ্ডলে॥

অন্ধরাজা বৃদ্ধ মন্ত্রী কণিককে ডেকে পাঠালেন, বললেন—

পাণ্ডবের যশ কীর্তি বাড়ে দিনে দিনে।
চিত্ত স্থির নহে মম ইহার কারণে॥

কণিক বললেন—বালক দেখিয়া শত্রু না করিবে ত্রাণ।

ব্যাধি, অগ্নি, রিপু, জল, একই সমান॥
বলিষ্ঠে, বুদ্ধিতে জিনি, মারিবেক বলে।
লুব্ধ জনে ধন দিয়া মারিবেক ছলে॥
বলে, ছলে শত্রুকে পাঠাবে যমদ্বার।
হেনমত আছে, রাজা, বেদের বিচার॥

এদিকে প্রজাদের মুখে যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা শুনে দুর্যোধন একদিন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসে বললো—

এই মত বিচার করয়ে সর্বজন।
রাজপুত্র যুধিষ্ঠির হইবে রাজন॥

এ ছার জীবনে আর নাহি প্রয়োজন।
নিশ্চয় মরিব আজি তব বিদ্যমান॥

কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির সঙ্গে পরামর্শ হোল। দুর্যোধন বললেন—

নগর বারণাবত দেশের বাহির।
ভ্রাতা মাতা সহ সেথা যাক যুধিষ্ঠির॥
হেথা আমি নিজরাজ্য স্ববশ করিলে।
এস্থানে আসিবে পুনঃ কতদিন গেলে॥

মন্ত্রীরা যুধিষ্ঠিরের কাছে বারণাবতের খুব প্রশংসা করলো। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বললেন—যদি ইচ্ছা হয় তো কয়েকদিন বারণাবতে গিয়ে থাকতে পার। স্থানটি অতি মনোরম।

পাঁচ ভাই মা কুন্তীকে সঙ্গে নিয়ে বারণাবতে গেলেন। সেখানে দুর্যোধন আগে থেকেই তাদের বাসের জন্য বাড়ী তৈরী করে রেখেছিলেন। মন্ত্রী পুরোচন তাদের সেই গৃহে নিয়ে গেলেন।

বিচিত্র নির্মিত মনোহর সে আলয়।
দেখি হৃষ্ট হইলেন ধর্মের তনয়॥
তবে কতক্ষণ পুরী করি নিরীক্ষণ।
ভীমে ডাকি যুধিষ্ঠির বলেন বচন॥
গৃহের পরীক্ষা দেখি লহ, বৃকোদর।
মম মনে বিশ্বাস না হয় এই ঘর॥
বৃকোদর নিলেন সে ঘরের আঘ্রাণ।
জানিলেন ঘর জতু ঘৃতের নির্মাণ॥
বৃকোদর বিস্মিত, কহেন যুধিষ্ঠিরে।
জৌ ঘৃত সরিষাতৈল গন্ধ পাই ঘরে॥

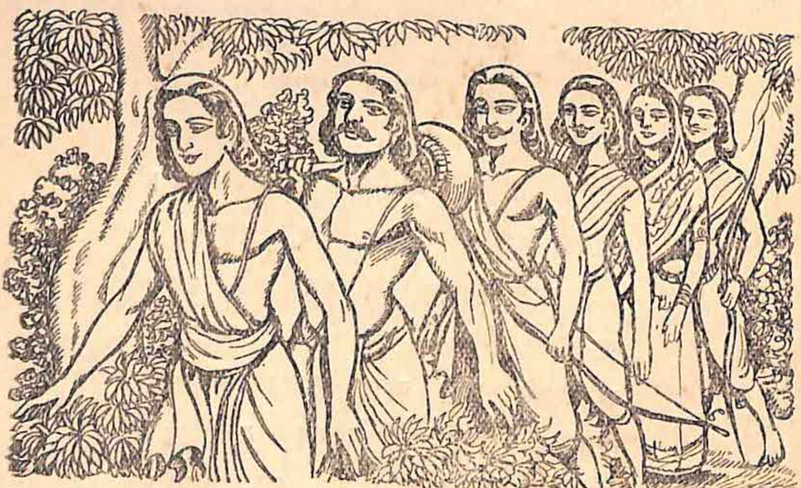
প্রত্যক্ষ অগ্নির ঘর ইথে নাহি আন।
আমা সবা দহিবারে করেছে নির্মাণ॥

যুধিষ্ঠির বললেন—বেশ, আমরা এখানে সাবধানে থাকবো।

এদিকে বিদুর সব জানতে পেরে একজন খনককে পাঠিয়ে দিলেন। লোকটি ঘরের মধ্যে একটি সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ফেললো। সেই সুড়ঙ্গ বরাবর চলে গেল গঙ্গাতীর পর্যন্ত।

সুড়ঙ্গ শেষ হলে, ভীমই এক রাত্রে সেই গৃহে আগুন লাগিয়ে দিল। তারপর সুড়ঙ্গ পথে নিজেরা বাহির হয়ে পড়লো।

ঘোর অন্ধকার নিশা গহন কানন।
লতা বৃক্ষ কণ্টকেতে যায় ছয় জন॥
রাজার কুমার সব, রাজার গৃহিণী।
তাহে অন্ধকার নিশা, পথ নাহি চিনি॥



কতদূর গিয়া কুন্তী হন অচেতন।
শীঘ্রগতি যাইতে না পারে পঞ্চজন॥
তবে বৃকোদর নিল মায়ে স্কন্ধে করি।
দুই স্কন্ধে মাদ্রীপুত্র, হস্তে দোঁহা ধরি॥
বায়ুবেগে যান ভীম লৈয়া পঞ্চ জনে।
বৃক্ষ, শিলা চূর্ণ হয় ভীমের চরণে॥
অতি শীঘ্র গতি যান ভীম মহাবীর।
নিশাযোগে উত্তরিল জাহ্নবীর তীর॥

বিদুর নৌকা রেখে দিয়েছিলেন গঙ্গার তীরে। সেই নৌকায় ছ'জনে গঙ্গা পার হয়ে গেলেন। এদিকে দূত গিয়ে অন্ধ রাজাকে খবর দিলেন যে পাণ্ডবেরা জতুগৃহে পুড়ে মরেছেন।

তবে ধৃতরাষ্ট্র শ্রাদ্ধ করিয়া বিধান।
ব্রাহ্মণেরে দিল বহু রত্ন, ধেনু দান॥

এদিকে গঙ্গাপার হয়ে পাণ্ডবেরা বনের মধ্যে দিয়ে চললেন। শেষে কুন্তী আর চলতে পারেন না। তৃষ্ণায় বড় কাতর হয়ে পড়লেন। তাঁরা এক জায়গায় বিশ্রাম করতে বসলেন। ভীম বেরুলেন জলের খোঁজে।

দু' ক্রোশ দূর থেকে যখন ভীম জল নিয়ে ফিরলেন তখন সবাই ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভীম আর তাঁদের জাগালেন না।

জাগিয়া রহিল ভীম বটবৃক্ষ মূলে।
চারিপুত্র সহ কুন্তী ঘুমান বিভোলে॥

সেই বনে হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষস থাকতো। ছ'জন মানুষ একত্র দেখে তো বেজায় খুসি। বোন হিড়িম্বাকে ডেকে বললো—

সুপ্রভাত, অকস্মাৎ মাংস উপনীত।
ছয় জনে মোর স্থানে আনহ ত্বরিত॥

হিড়িম্বা এলো ভীমের কাছে। বললো—

কহ তুমি কোন জন কোথা হতে আগমন,
কি হেতু আইলা এই বন।
দেবতার মূর্তি প্রায়, ভূমিতলে নিদ্রা যায়,
কেবা হয় এই চারিজন॥
পূর্ণবয়া নিরুপমা, সুবদনী, ঘনশ্যামা;
এ বামা তোমার কেবা হয়।
এ ঘোর দুর্গমবনে, নিদ্রা যায় অচেতনে,
নাহি জান রাক্ষস-আলয়॥

ভীম হেসে বললেন—রাক্ষসকে আমি ভয় করিনা।
ওদিকে হিড়িম্বের আর দেরী সইল না, সে নিজেই দৌড়ে এল ভীমের সঙ্গে বেধে গেল তার লড়াই।



ভীম, হিড়িম্বের যুদ্ধ না যায় বর্ণনা।
যুগল পর্বত প্রায় দেখি দুই জনা॥
যুদ্ধ-ধূলি-ধূসর দোঁহার কলেবর।
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদিত যেন গিরিবর॥

শেষে ভীম এক আছাড়ে রাক্ষসকে মেরে ফেললো।

এদিকে সেই গোলমালে আর সবাইকার ঘুম ভেঙে গেছে। কুন্তী তো হিড়িম্বাকে দেখে অবাক, জিজ্ঞাসা করলেন—

কে তুমি, কোথায় হৈতে আইলা গো হেথা।
অপ্সরী নাগিনী কিম্বা বনের দেবতা।

হিড়িম্বা নিজের পরিচয় দিল।

যুধিষ্ঠির বলেন, শুনহ, ভ্রাতৃগণ।
লোক মুখে এই বার্তা পাবে দুর্যোধন॥
সে কারণে ক্ষণেক রহিতে না যুয়ায়।
শীঘ্র চল অন্য স্থান, ত্যজিয়া হেথায়॥
এতেক ভাবিয়া মনে পাণ্ডুপুত্র গণ।
মাতা সহ শীঘ্র গতি করেন গমন॥

হিড়িম্বাও চললো তাদের সঙ্গে। ভীম বললো—হিড়িম্বা আসে কেন?

হিড়িম্বা কুন্তীকে বললো—

আজ্ঞা কর আমা বরিবারে বৃকোদরে।
নইলে ত্যজিব প্রাণ তোমার গোচরে॥

যুধিষ্ঠির বললেন—হিড়িম্বা যখন ভীমকে বিবাহ করতে চায়, তখন ভীমের বিবাহ করাই উচিত।

যুধিষ্ঠিরের আদেশ, ভীম হিড়িম্বাকে বিবাহ করলো।

পরে এই হিড়িম্বার এক পুত্র জন্মে, তার নাম ঘটোৎকচ, জন্মমাত্রেই ঘটোৎকচ বড় মানুষের মত ভীমকে বললো—

আজ্ঞা কর, যাব মোরা আপন আলয়।
স্মরিলে আসিব, এই রহিল নিশ্চয়॥

পুত্রকে নিয়ে হিড়িম্বা চলে গেল।

জননী সহিত, হেথা, পাণ্ডুপুত্রগণ
নানা দেশ নানা স্থান করেন ভ্রমণ॥
পরিধান বল্ক, শিরে শোভে জটাভার।
কোথায় ব্রাহ্মণ, কোথা তপস্বী আকার॥
পাইয়া নগর এক একচক্র নাম।
তথা গিয়া সর্বজন করেন বিশ্রাম॥
অতিথি হইয়া এক ব্রাহ্মণের ঘরে।
আনন্দে কাটান কাল পরম আদরে॥

সারাদিন পাঁচভাইয়ের ভিক্ষা করে কাটে, সন্ধ্যাবেলা সকলে মায়ের কাছে ফিরে আসেন।

একদিন গৃহেতে রহিল বৃকোদর।
ভিক্ষাতে গেলেন আর চারি সহোদর॥
আচম্বিতে বিপ্রগৃহে মহাশব্দ শুনি।
বিলাপ করিয়া কান্দে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী॥

কুন্তী গিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা কাঁদছ কেন ?

ব্রাহ্মণ বললো—এই ত নগরে আছে বক নিশাচর।
অত্যন্ত দুরন্ত সেই রাজ্যের ঈশ্বর॥
নগর নিবাসী ইথে আছে যত নর।
নির্ণয় করিল তার সনে এই কর॥

পায়স, পিষ্টক, অন্ন শকট পূরিয়া।
নর এক, সঙ্গে দুই মহিষ লইয়া॥
ভক্ষ্যরূপে যাইবেক গৃহেতে তাহার।
এই কর বিনা অন্য নাহি কর আর॥
হেনরূপে বলি নাহি দেয় যেই জন॥
সকুটুম্ব তারে বক করয়ে ভক্ষণ॥
আজি তার পঞ্চক হইল মম ঘরে।
কি করিব, কি হইবে, বাক্য নাহি সরে॥
এই ভার্যা, কন্যা, পুত্র আছি চারিজনা।
কারে দিব বলিদান করি সে ভাবনা॥
কারো মায়া তেয়াগিতে নারে কোনজনে।
সবে মেলি যাব মোরা, যে থাকে লিখনে॥

কুন্তী বললেন—পঞ্চপুত্র আছে মম, শুন হে ব্রাহ্মণ।
এক পুত্র দিব আমি তোমার কারণ॥

ব্রাহ্মণ বললেন—তা হয় না, তোমরা অতিথি ব্রাহ্মণ।—
আত্ম দিয়া দ্বিজে রাখে, বেদে হেন কয়।
দ্বিজ দিয়া আত্মরক্ষা উচিত না হয়॥

কুন্তী বললেন—সেজন্য কোন চিন্তা নেই, আমার ছেলে অনেক রাক্ষস মেরেছে, রাক্ষসে তার কিছুই করতে পারবে না।

নিশাকালে বৃকোদর শকটে চড়িয়া।
যথা বক বৈসে বনে, উত্তরিল গিয়া॥
রে রে বক নিশাচর! আইস সত্বর।
এত বলি অন্ন খায় বীর বৃকোদর॥

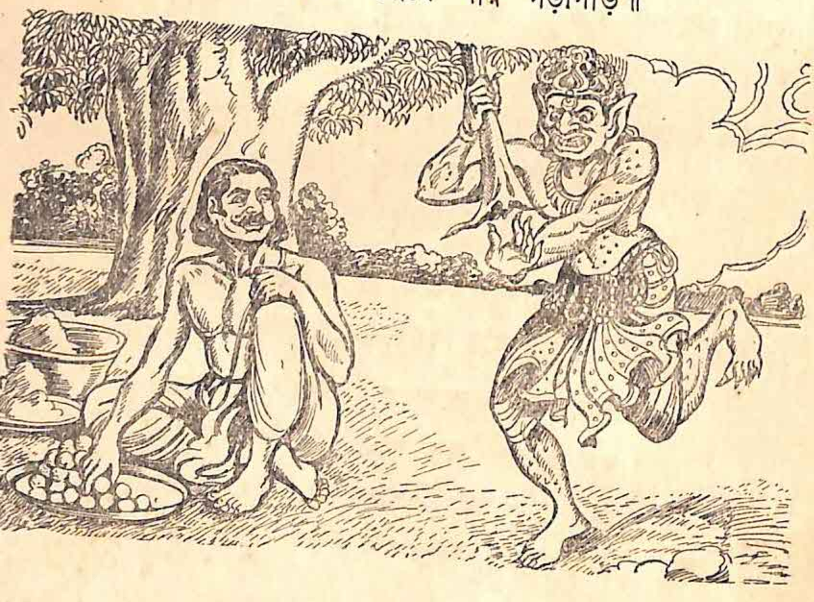
নাম ধরি ডাকাতে ক্রোধেতে থর, থর।
বক বীর আসে যেন পর্বত শিখর॥
অন্ন খায় বৃকোদর দেখি বিদ্যমান।
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন অরুণ সমান॥

বক এসে ভীমকে প্রহার করতে সুরু করলো।

পৃষ্ঠে যে রাক্ষস মারে সহেন হেলায়।
পায়সান্ন খান বীর বসি নিঃশঙ্কায়

তারপর আহার শেষ করে ভীম বক রাক্ষসকে চেপে ধরলেন।—

শিলাবৃষ্টি করে দোঁহে দোঁহার উপর।
বাহু, বাহু যুদ্ধ হৈল দেখি ভয়ঙ্কর॥
মুণ্ডে, মুণ্ডে, বুকে বুকে, ভুজে ভুজে তাড়ি।
ধরা-ধরি করি দোঁহে যায় গড়াগড়ি॥



যুদ্ধেতে হইল শ্রান্ত বক নিশাচর।
রাক্ষসে ধরিল বীর কুন্তীর কোঙর॥
মধ্যে, মধ্যে ভাঙ্গিয়া করেন দুইখান।
মহাশব্দ করি বক ত্যজিল পরাণ॥
রজনী প্রভাত হৈল, উদিত তপন।
বাহির হইল যত নগরের জন॥
দেখিয়া সকল লোক হৈল চমৎকার।
পড়িয়াছে বক যেন পর্বত আকার॥

পাণ্ডবেরা সেইখানেই আছেন, একদিন লোক মুখে খবর পেলেন—পাঞ্চাল রাজ্যের রাজা দ্রুপদের মেয়ে কৃষ্ণার স্বয়ম্বর হবে। কুন্তী ছেলেদের বললেন—চল, যাই সেখানে।

পাণ্ডবেরা পাঞ্চাল দেশে এসে এক কুম্ভকারের গৃহে আশ্রয় নিলেন। ভিক্ষা করেই তাদের দিন চলতে লাগলো। এদিকে—

স্বয়ম্বর-সজ্জা করে পাঞ্চাল-ঈশ্বর।
অদ্ভুত করিল লক্ষ্য লোকে অগোচর॥
হেন ধনু কৈল যাহা কেহ নাহি দেখে।
শূন্যেতে রাখিল ধনু অসম্ভব লোকে॥
মধ্যপথে যন্ত্র রাখে মন্ত্র বিরচিত।
পঞ্চশর সহ ধনু করিল স্থাপিত॥
সেই ধনুঃশরে সেই রন্ধ্র অনুসারে।
যে বিন্ধিবে লক্ষ্য, কন্যা বরিবে তাহারে॥
করিয়া দ্রুপদ রাজা এই মত পণ।
রাজগণে সর্বত্র করিল নিমন্ত্রণ॥

সাগর অবধি যত রাজগণ বৈসে।
সসৈন্যে আইল সবে পাঞ্চালের দেশে ॥
জল, স্থল, পর্বত, কানন, নদ, নদী।
দশ দিক যুড়ি লোক আসে নিরবধি ॥
ধ্বজ, ছত্র, পতাকায় ঢাকিল মেদিনী।
লোক-কলরবে অন্য কিছুই না শুনি ॥
যতেক আসিল রাজা না যায় বর্ণনা।
চতুরঙ্গ দল সহ লয়ে নিজ সেনা ॥
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির শতেক কুমার।
দুর্যোধন, দুঃশাসন সহ যত আর ॥
ভীষ্ম, দ্রোণ, দ্রৌণী, কর্ণ, কৃপ, সোমদত্ত।
কোটি কোটি রথ অশ্ব পদাতিক মত্ত ॥
জরাসন্ধ, শিশুপাল, শল্য মদ্রপতি।
শকুনি, বিরাট, ভগদত্ত রাজা আদি ॥
হেনমতে তথায় ষোড়শ দিন গেল।
এক লক্ষ রাজা যবে সভায় বসিল ॥
দ্রৌপদীর পুরোহিত পড়িল মঙ্গল।
যাত্রা কৈল সভা মধ্যে পূজিয়া অনল ॥
সভা মধ্যে যখন দ্রৌপদী উপনীত।
দেখি সব রাজগণ হইল মূর্ছিত ॥
হুড়াহুড়ি করি সবে যায় বায়ু বেগে।
সবে বলে, রহ, লক্ষ্য আমি বিন্ধি আগে ॥

প্রথমে এলেন মগধের রাজা জরাসন্ধ।—

অতিশয় ধনুর্ধর ধনুকের ভরে।
মূর্ছা হৈয়া নৃপতি পড়িল কতদূরে॥

তারপর উঠলেন দুর্যোধন।—

মুখে রক্ত উঠিল, কম্পিত কলেবর।
কত দূরে মূর্ছা হৈয়া ধূলায় ধূসর॥

তারপর চেদীর রাজা শিশুপাল।—

ধনুহুল চিবুকে লাগিয়া উলটিল।
কতদূরে রাজগণ উপরে পড়িল॥

তারপর রুক্মী, ভগদত্ত, শল্য, শাল্ব, প্রভৃতি রাজারা একে একে এগিয়ে এলেন।—

একে একে সবাই করিল পরাক্রম।
ধনু নোয়াইতে কেহ না হইল ক্ষম॥

তারপর উঠলেন ভীষ্ম। তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু দেহে অসীম শক্তি। ধনুকে শর যোজনা করে তিনি বললেন—

কন্যাতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন।
আমি লক্ষ্য বিন্ধিলে লইবে দুর্যোধন॥

কিন্তু তীর ছোড়ার আগেই তিনি দেখলেন শিখণ্ডী সামনে দাঁড়িয়ে আছে।—

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আছে খ্যাত চরাচর।
অমঙ্গল দেখিলে ছাড়েন ধনুঃশর॥
শিখণ্ডী দ্রুপদ পুত্র; নপুংসক জাতি।
তার মুখ দেখি ধনু থু'লা মহামতি॥

এবার দ্রোণ।—

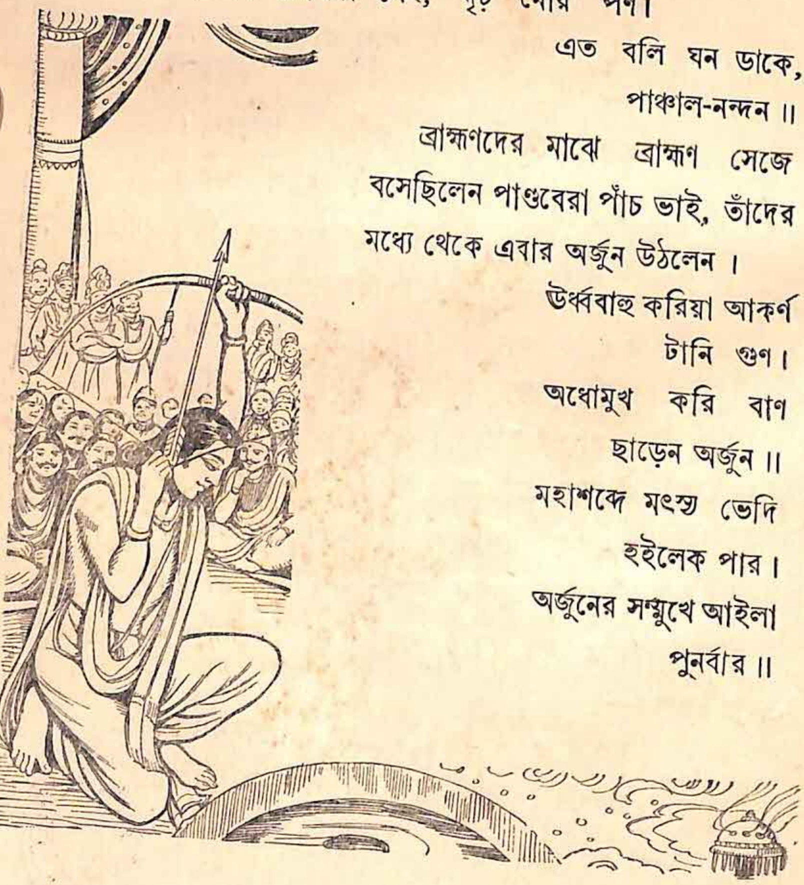
মহাশব্দে উঠে বাণ গগনমণ্ডল।
সুদর্শন ঠেকিয়া পড়িল - ভূমিতল॥

তারপর দ্রোণের পুত্র দ্রৌণি উঠলেন—

গর্জিয়া উঠিল বাণ উল্কার সমান।
রাধাচক্রে ঠেকিয়া হইল খান, খান॥

তখন উঠলেন কর্ণ, তাঁর অবস্থা হোল দ্রৌণির মত।
তখন দ্রুপদকুমার ঘোষণা করলেন—

দ্বিজ হৌক, ক্ষত্র হৌক, বৈশ্য শূদ্র আদি।
চণ্ডাল প্রভৃতি লক্ষ্য বিন্ধিবেক যদি॥
লভিবে দ্রৌপদী সেই, দৃঢ় মোর পণ।
এত বলি ঘন ডাকে,
পাঞ্চাল-নন্দন॥



ব্রাহ্মণদের মাঝে ব্রাহ্মণ সেজে বসেছিলেন পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই, তাঁদের মধ্যে থেকে এবার অর্জুন উঠলেন।

ঊর্ধ্ববাহু করিয়া আকর্ণ
টানি গুণ।
অধোমুখ করি বাণ
ছাড়েন অর্জুন॥
মহাশব্দে মৎস্য ভেদি
হইলেক পার।
অর্জুনের সম্মুখে আইলা
পুনর্বার॥

বিন্ধিল, বিন্ধিল, বলি হৈল মহাধ্বনি।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন সব নৃপমণি॥
হাতে দধিপাত্র, মাল্য দ্রৌপদী সুন্দরী।
পার্থের নিকটে গেলা কৃতাঞ্জলি করি॥

রাজারা বললেন—এ কী!

ক্ষত্র-স্বয়ম্বর, ইথে দ্বিজের কি কাজ।
দ্বিজ হয়ে কন্যা লবে, ক্ষত্রকুলে লাজ॥
মারহ দ্রুপদে আজি পুত্রের সহিত।
মার এই ব্রাহ্মণেরে, বধে নহ ভীত॥

সব রাজারা তখন এক চোটে দ্রুপদকে আক্রমণ করলো, অর্জুনকেও ঘিরে ধরলো। ভীম তাড়াতাড়ি একটি গাছ উপড়ে নিয়ে এগিয়ে এলো। রাজাদের সঙ্গে দু' ভাইয়ের যুদ্ধ বেধে গেল।

গদাহস্তে শল্য রাজা, তরুহস্তে ভীম।
দোঁহাকার মহাযুদ্ধ হইল অসীম॥

শল্যেরে ধরিয়া ভীম
ভূমে ফেলি বৃক্ষে।
পায় ধরি তাহারে
ঘুরায় অন্তরীক্ষে॥



মৃত প্রায় করিয়া শল্যেরে ছাড়ি দিল।
দেখিয়া সকল রাজা বিস্ময় মানিল॥
অর্জুন, কর্ণের যুদ্ধ লোকেতে ভীষণ।
করিলেন যুদ্ধ যেন শ্রীরাম রাবণ॥
যত অস্ত্র ফেলে কর্ণ তত অস্ত্র কাটি।
নিরস্ত্র করিয়া অস্ত্র এড়েন কিরিটি॥
চারি বাণে কাটেন রথের চারি হয়।
সারথি কাটেন তার বীর ধনঞ্জয়॥
নিরথ হৈল কর্ণ যুদ্ধের ভিতর।
দেখি হাহাকার করে সব নৃপবর॥
বিস্ময় মানিল চিত্তে যত রাজগণ।
জানিল মনুষ্য নহে এই দুইজন॥
কোথা রথ, কোথা গজ, কোথা ভৃত্যগণ।
প্রাণ মাত্র লয়ে সবে করে পলায়ন॥

যুদ্ধ শেষ হোল, পাঁচ ভাই দ্রৌপদীকে নিয়ে গৃহে ফিরলো। বাইরে থেকে ভীম বললো—মা, আজ ভিক্ষা করতে গিয়ে বড় সুন্দর জিনিষ এনেছি।

কুন্তী বললেন—বেশ, যা পেয়েছ পাঁচ ভাই বেঁটে ভাগ করে নাও!

তারপর কুন্তী বাহির হয়ে দেখেন—রাজকন্যা! তাইত, পাঁচজনে ভাগ করে নেবার কথা বললেন, তাহলে তাঁর কথা তো মিথ্যা হয়।

যুধিষ্ঠির বললেন—মার কথা মিথ্যা হতে পারে না, আমরা পাঁচ ভাই দ্রৌপদীকে বিবাহ করবো।

এদিকে দ্রুপদ রাজা পরদিন পাঁচ ভাইকে সভায় নিয়ে গেলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—সত্যি করে বলুন তো আপনারা কে?

যুধিষ্ঠির মিথ্যা কথা বলেন না, বললেন—

আমরা যে পঞ্চভাই পাণ্ডুর তনয়।
আমি যুধিষ্ঠির, এই ভীম, ধনঞ্জয়॥
এ নকুল, সহদেব জানহ নৃপতি।
অন্তঃপুরে মাতা কুন্তী সহিত পার্ষতী॥

দ্রুপদ শুনে খুব খুসি হলেন। কিন্তু পাঁচ ভাই দ্রৌপদীকে বিয়ে করবেন শুনে বিস্মিত হলেন, এমন কথা তো কেউ কখনও শোনে নি। ব্যাসদেব ছিলেন সভার মাঝে, তিনি বললেন—এ বিধির নির্বন্ধ!—

ত্রেতাযুগে দ্বিজকন্যা আছিল দ্রৌপদী।
পতি বাঞ্ছা করি শিব পূজে নিরবধি॥
রচিয়া মৃত্তিকা-লিঙ্গ, নানাপুষ্প দিয়া।
ঘৃত মধু উপহার, বাদ্য বাজাইয়া॥
অবশেষে প্রণমিয়া পড়ি ক্ষিতিতলে।
পতিং দেহি, পতিং দেহি, পঞ্চবার বলে॥
হেনকালে বহুকাল পূজয়ে মহেশ।
তুষ্ট হৈয়া বর তারে দেন ব্যোমকেশ॥
পঞ্চস্বামী হৈবে তোর পরম সুন্দর।
শুনিয়া বিস্ময় মানি কহে যোড় কর॥
কেন হেন উপহাস কর, শূলপাণি।
লোকে, বেদে বহির্ভূত অপূর্ব কাহিনী॥
শঙ্কর বলেন, কন্যে কি দোষ আমার।
স্বামীবর তুমি যে মাগিলা পঞ্চবার॥
অকারণ, কন্যে, নাহি করিহ রোদন।
কখন খণ্ডন নহে আমার বচন॥

এত বলি অন্তর্হিত হইলেন হর।
গঙ্গা জলে কন্যা গিয়া ত্যজে কলেবর॥

সেই কন্যাই এই জন্মে দ্রৌপদী হয়ে জন্মেছে।

আর কথা কি, খুব ধূমধাম করে পাঁচ ভাইদের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিয়ে হয়ে গেল।

দুর্যোধন দেখলেন যে পাণ্ডবেরা এখনও বেঁচে আছে, এবার তিনি নূতন মতলব করার জন্য পরামর্শ করতে বসলেন—দ্রুপদ রাজাকে অর্থ দিয়ে বশ করে তাকে বলি, পঞ্চ পাণ্ডবকে মেরে ফেলুক! নয়তো পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিই, ওরা নিজেরাই কাটাকাটি মারামারি করে মরুক। নাহলে ওদের অন্তঃপুরে লোক পাঠিয়ে দিই বিষ খাইয়ে ওদের মারুক!

কিন্তু এসব কোন কাজের কথা নয়। ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করলেন। ভীষ্ম বললেন—

এক্ষণেতে এই কর্ম করহ, রাজন।
পাণ্ডুপুত্রগণ সঙ্গে করহ মিলন॥
অর্ধ রাজ্য দিয়া কর পাণ্ডবেরে বশ।
পৃথিবী যুড়িয়া, রাজা, হবে তব যশ॥

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে পাঠালেন পাণ্ডবদের কাছে। পাণ্ডবেরা বিদুরের সঙ্গে হস্তিনায় ফিরলেন। তারপর ধৃতরাষ্ট্র একদিন পাণ্ডবদের ডেকে বললেন—

খাণ্ডব প্রস্থেতে যাহ, পঞ্চ সহোদর।
অর্ধ রাজ্য ভোগ কর ইন্দ্রের সোসর॥

পাণ্ডবেরা খাণ্ডব প্রস্থে নগর বসালেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এলেন তাঁদের সাহায্য করতে।—

প্রাচীর হইল উচ্চ আকাশ সমান।
চতুর্দিকে গড়খাই সমুদ্র প্রমাণ॥
উচ্চ উচ্চ মন্দির করিল মনোরম।
কিবা সে অমরাবতী, ভোগবতী সম॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্র, বৈশ্য জাতি।
নগরের মধ্যস্থলে করিল বসতি॥
পাঠক, লেখক, বৈদ্য, চিকিৎসক-জন।
সদ্গোপ, বণিক জাতি, যত শূদ্রগণ॥
বসিল সকল লোক নগর ভিতরে।
পাণ্ডব নগরে বৈসে, ইন্দ্রে নাহি ডরে॥
স্থানে স্থানে নগরে রোপিল বৃক্ষগণ।
পিপ্পলী, কদম্ব,, আম্র, পনস, কাঞ্চন॥
জম্বীর, পলাশ, তাল, তমাল, বকুল।
নাগেশ্বর, কেতকী, চম্পক, রাজকুল॥
কদলী, গুবাক, নারিকেল, সুখর্জুর।
নানাবর্ণে বৃক্ষ শোভে যেন সুরপুর॥
স্থানে স্থানে খোদাইল দীঘি পুষ্করিণী।
জলচর পক্ষিগণ করে তাহে ধ্বনি॥
দ্বিতীয় ইন্দ্রের পুর দেখি সুশোভন।
ইন্দ্রপ্রস্থ নাম রাখিলেন নারায়ণ॥

নারদ একদিন এলেন ইন্দ্রপ্রস্থে। তিনি নিয়ম করে গেলেন যে দ্রৌপদী পাঁচ ভাইয়ের বউ, যখন কোন ভাই দ্রৌপদীর সঙ্গে কথাবার্তা কইবে, তখন অন্য কোন ভাই গিয়ে তার মাঝে বাধা

দেবে না, যদি কেউ এই নিয়ম ভাঙে তাহলে সে বারো বছর সন্ন্যাসী হয়ে বনে বাস করবে।

এদিকে হোল কি একদিন এক ব্রাহ্মণ এসে অর্জুনের কাছে নালিশ জানালো—

হরিয়া আমার গবী যায় দুষ্টগণ।
শীঘ্রগতি চল, তারা গেল এতক্ষণ॥

চোরকে ধরার জন্য অর্জুন গেলেন অস্ত্রাগারে, সেখানে দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠির কথাবার্তা কইছিলেন, অর্জুন ভিতরে যাওয়ায় কথাবার্তায় বাধা পড়লো। তখনকার মত অস্ত্র নিয়ে অর্জুন তো চলে গেলেন। তারপর চোরকে মেরে, ব্রাহ্মণের গরু উদ্ধার করে যখন ফিরে এলেন, তখন সেই নিয়মের কথা উঠলো। অর্জুন বললেন—

সত্যে বিচলিত হই, নাহি চাহে মন।
আজ্ঞা কর, মহারাজ, যাব আমি বন॥

অর্জুন বনে চলে গেলেন।

বারো বছরের জন্য বনবাস। বারো বছর বড় কম সময় নয়। এই সময় অর্জুন নানা তীর্থ পর্যটন করলেন, নানা বিপদেও পড়লেন।— কতদিনে হরিদ্বারে করিলা গমন।

গঙ্গায় প্রবেশি পার্থ করেন তর্পণ॥
জল হৈতে নাগকন্যা অর্জুনে ধরিল।
বলে ধরি আপন মন্দিরে লয়ে গেল॥

নাগকন্যা উলূপীকে বিবাহ করে অর্জুন সেখান থেকে মুক্তি পেলেন।

গয়া, গঙ্গা, প্রয়াগ, নৈমিষ্যারণ্য আদি।
পৃথিবীতে যত তীর্থ, যত নদ, নদী॥

অঙ্গ বঙ্গ মধ্যেতে যতেক তীর্থ বৈসে।
দেখি পার্থ যান পরে মণিপুর দেশে॥

সেখানকার রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।

তারপর গঙ্গার ধারে গিয়ে পড়লেন পঞ্চতীর্থে। এখানে স্নান করার জন্যে জলে নামতেই অর্জুনকে কুমীরে ধরে। কুমীর অর্জুনকে জলে টেনে নিয়ে যাবে কি, অর্জুনই কুমীরকে ডাঙ্গায় টেনে নিয়ে এলেন। জল থেকে তুলতেই কুমীর হয়ে গেল এক অপ্সরা। সে মুনির শাপে কুমীর হয়েছিল, এতদিনে তার শাপ মোচন হোল।

তারপর অর্জুন গেলেন প্রভাসে। সেখান থেকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে নিয়ে গেলেন রৈবতকে। শ্রীকৃষ্ণের এক বোন ছিল সুভদ্রা, তার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ দেবেন বলে স্থির করলেন—

রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, বলে বলবান।
পার্থ মাত্র যোগ্য তার করি অনুমান॥

বলরাম বললেন—কিন্তু আমি যে দুর্যোধনের কাছে দূত পাঠিয়েছি।

শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু দুর্যোধনকে পছন্দ করেন না।

অর্জুনে ডাকিয়া বলিলেন নারায়ণ।
শুনিলে কি, অর্জুন, আইলা দুর্যোধন॥
মৃগয়ার ছলে তুমি চড়ি মম রথে।
ভদ্রারে লইয়া যাহ ইন্দ্রপ্রস্থ পথে॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে রথ দিলেন, সুভদ্রা স্নান করতে গিয়েছিল, অর্জুন তাকে রথে তুলে নিয়ে দৌড় দিল।

খবর পেয়ে বলরাম রাগে কাঁপতে লাগলেন—

এই দোষে তারে আজি মারিব সমূলে।
বাতি দিতে না রাখিব পাণ্ডবের কুলে ॥
ইন্দ্রপ্রস্থ মাটি আজি তাড়িয়া লাঙ্গলে।
ফেলাইয়া দিব লয়ে সমুদ্রের জলে ॥

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম আছে শাস্ত্রের গোচরে।
বলেতে বিবাহ করে প্রশংসে তাহারে ॥

কাজেই অর্জুন তো কোন অন্যায় কাজ করেন নি।—

এক্ষণে আনায়ে তারে করাই বিবাহ।
সংপ্রীতে সুভদ্রা তুমি তারে সমর্পহ ॥

দূত গিয়ে অর্জুনকে ফিরিয়ে আনলো, সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিয়ে হয়ে গেল।

তারপর কিছুদিন অর্জুন দ্বারকাতেই আছেন। একদিন যমুনার তীরে এক ব্রাহ্মণ এসে অর্জুনকে বললো—

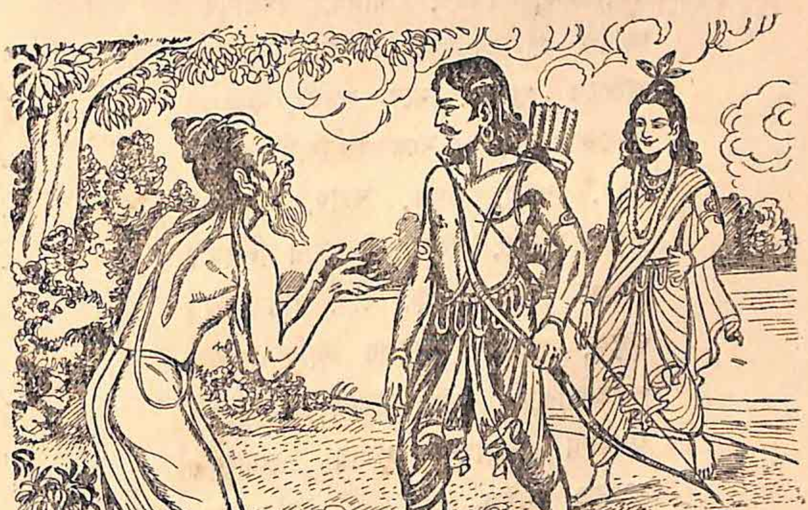
এই হেতু আসিয়াছি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
দুই জনে মিলি মোরে করাহ ভোজন ॥

অর্জুন বললেন—কি খাবেন, বলুন ?

ব্রাহ্মণ বললেন—আমি অগ্নি, আমার ইচ্ছা যে আমি খাণ্ডব বনকে খাই, তুমি তার ব্যবস্থা কর।—

ব্যাধিযুক্ত বহুকাল আমার শরীর।
নির্ব্যাধি করহ মোরে, পার্থ মহাবীর ॥
শ্বেতকি রাজার যজ্ঞে অতুল সংসারে।
দুর্বাসা আহুতি দিল মুষলের ধারে ॥

দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ কৈল অবিরাম।
তিনলোক চমৎকার শুনে যজ্ঞনাম॥
সেই হবি খাইয়া হইনু মন্দানল।
ব্যাধিযুক্ত কলেবর হইল দুর্বল॥
বিরিঞ্চি কহিলা মোরে, শুন হুতাশন।
খাণ্ডব বনেতে আছে বহু জীবগণ॥
যদি পার সেই বন দগ্ধ করিবারে।
তবে ত না রবে রোগ তোমার শরীরে॥
বহু চেষ্টা করিয়াছি দহিতে সে বন।
কিন্তু তবু পারি নাই করিতে দহন॥
সে বন দহিতে বিঘ্ন আছে বহুতর।
বনের রক্ষক সদা দেব পুরন্দর॥



অর্জুন বলললেন—ইন্দ্রকে ভয় করি না, কিন্তু আমার রথ নেই, অস্ত্র নেই।

অগ্নি তখনই বরুণকে ডেকে, গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণ আর কপিধ্বজ রথ আনিয়ে দিলেন। আর শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়ে দিলেন সুদর্শন চক্র, আর কৌমুদকী গদা। এবার শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুন খাণ্ডব বনে আগুন দিলেন।

শতেক যোজন বন খাণ্ডব বিস্তার।
অনল উঠিল তাহে পর্বত আকার॥
প্রলয়ের মেঘ যেন শুনি গড়গড়ি।
নানাবিধ বৃক্ষ পোড়ে শুনি বড়বড়ি॥
নানাজাতি পশু পোড়ে, নানা পক্ষিগণ।
নানাজাতি পুড়িয়া মরয়ে নাগগণ॥
যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, দানব, বিদ্যাধর।
অনেক পুড়িয়া মরে অরণ্য ভিতর॥
জলেতে পুড়িয়া মরে শফরী, কচ্ছপ।
বনেতে পুড়িয়া মরে বনবাসী সব॥
সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বরাহ, মৃগগণ।
মহিষ, শার্দূল, খড়্গী না যায় লিখন॥
অসংখ্য কুঞ্জর পোড়ে, দীর্ঘ, দীর্ঘ দন্ত।
জম্বুক, শশক, নকুলের নাহি অন্ত॥
পর্বত-আকার অগ্নি উঠিল আকাশে।
স্বর্গবাসী দেবগণ পলায় তরাসে॥
ভয়েতে লইল সবে ইন্দ্রের শরণ।
দেবরাজে জানাইল খাণ্ডব দহন॥

ইন্দ্রের বন, ইন্দ্র এলেন যুদ্ধ করতে।—

তবে ইন্দ্র ক্রোধভরে আজ্ঞা দিল জলধরে
বৃষ্টি করি নিবার অনল
আজ্ঞামাত্র অতিবেগে, সম্বর্তাদি চারিমেঘে,
মুষল ধারায় ফেলে জল॥
দেখি পার্থ মহাবল, না পড়িতে বৃষ্টিজল,
শোষক, রায়ব্য অস্ত্র এড়ে।
শূন্যে অস্ত্র উঠে রোষে শোষকে সলিল শোষে
বায়ব্যে সকল মেঘ উড়ে॥

ইন্দ্র হেরে গেলেন, অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে রুখতে পারলেন না। সেই আগুন থেকে ছ'টি প্রাণী মাত্র রক্ষা পেল,—তক্ষকের পুত্র অশ্বসেন, ময়দানব, আর চারটি বকের ছানা। অশ্বসেনকে বাঁচিয়েছিল তার মা। ময়দানব অর্জুনের কাছে মিনতি করে জীবন রক্ষা করেছিল, আর বকের ছানাগুলিকে অগ্নি দয়া করে পোড়ান নি।

তবে কতদিন পার্থ রহি দ্বারাবতী।
ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিলেন সুভদ্রা সংহতি॥

সভাপর্ব

খাণ্ডব বনের আগুন থেকে রক্ষা পেয়ে ময়দানব একদিন অর্জুনকে এসে বললেন—

দানব কুলের শ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্মা আমি।
করিব অবশ্য, যাহা আজ্ঞা কর তুমি॥

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—তুমি এদের জন্য এক রাজসভা তৈরী করে দাও!

হেন সভা কর যাহা কেহ নাহি দেখে।
অদ্ভুত হইবে সুরাসুর তিনলোকে॥

ময়দানব সভা তৈরী করে দিলেন।—

গড়িলেক সভা দিয়া মুকুতা, প্রবাল।
মরকত, রজত, কনক, চিত্র জাল॥
স্ফটিকের স্তম্ভে শোভে চিত্র, মণি, হীরা।
সর্ব গৃহে লম্বে মণি, মুকুতার ঝারা॥
বসিবার স্থান সব কৈল রত্ন ছেদি।
বিচিত্র রচন কৈল নানামত বেদী॥
নানাজাতি বৃক্ষ সব ফল ফুলে শোভে।
ভ্রময়ে ভ্রমরগণ মকরন্দ লোভে॥

সভা দেখে তো পাণ্ডবেরা ভারী খুসি। দেশ-বিদেশ থেকে যত মুনি-ঋষি, রাজা-মহারাজা সেই সভা দেখতে এলেন। নারদও এলেন স্বর্গ থেকে, যুধিষ্ঠিরকে বললেন—তোমার বাবা পাণ্ডু স্বর্গে আছেন,

তিনি আমাকে বলে দিলেন—আমার পুত্রদের বলবেন রাজসূয় যজ্ঞ করতে।

যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে ডেকে পাঠালেন, পরামর্শ করার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ বললেন—জরাসন্ধকে জয় করতে না পারলে রাজসূয় যজ্ঞ করা চলবে না।—মগধ-ঈশ্বর জরাসন্ধ শ্রেষ্ঠ রাজা।

পৃথিবীর যত রাজে করে তারে পূজা॥
অসংখ্য তাহার সৈন্য কে গণিতে পারে।
ক্ষয় নহে মারিলেও শতেক বৎসরে॥
ছিয়াশীটি ভূপে রাখিয়াছে বন্দিশালে।
তব যজ্ঞ হয় তারা সব মুক্ত হৈলে॥

শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের পরিচয় দিলেন—বৃহদ্রথ নামে মগধে এক রাজা ছিলেন। তাঁর দুই রাণী ছিল। অনেক দিন তাঁর কোন সন্তান না হওয়ায়, রাজার মনে বড় দুঃখ। তিনি স্থির করলেন রাজ্য ছেড়ে বনে চলে যাবেন। এমন সময় মগধে চণ্ডকৌশিক নামে এক ঋষি এলেন। রাজা ঋষির চরণে নিজের দুঃখের কথা নিবেদন করলেন। মুনি ধ্যানে বসলেন, সামনের আম গাছ থেকে একটি আম পড়লো, ঋষি সেই আমটি রাজাকে দিয়ে বললেন—'এই আমটি খেলে রাণীর পুত্র হবে।' রাজার দুই রাণী আমটিকে আধাআধি ভাগ করে খেলেন। দুই রাণীর দুইটি ছেলে হোল, কিন্তু আধাআধি—

এক চক্ষু, নাসা, কর্ণ, এক পদ, কর।
অর্ধ, অর্ধ অঙ্গ দেখি বিস্ময় অন্তর॥

এমন ছেলে কি হবে ?—

নিরাশ হইয়া দোঁহে ঘৃণা করি মনে।
ফেলাইয়া দিতে আজ্ঞা কৈল দাসীগণে॥

জরা নামে এক রাক্ষসী সেটি দেখতে পেয়ে, দুই অর্ধেককে জুড়লে কেমন হয় দেখতে গিয়ে যেই দুটি একত্র করেছে অমনি ছেলেটি 'উঙা উঙা' করে কেঁদে উঠলো। রাক্ষসী তখন ছেলেকে এনে দিল রাজার কাছে। জরা রাক্ষসী ছেলেকে জুড়ে দিয়েছিল, তাই রাজা পুত্রের নাম রাখেন জরাসন্ধ। জরাসন্ধের জামাই হচ্ছেন কংস, কংসের মৃত্যুর পর ইনি আঠারো বার মথুরা আক্রমণ করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ এঁর ভয়েই দ্বারকায় চলে যান। তাঁর সঙ্গে লড়াই করে তাঁকে হারানো সহজ কথা নয়!

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পরামর্শ করে, ভীম ও অর্জুন তাঁর সঙ্গে রাজগৃহ যাত্রা করলেন।

সরযূ অযোধ্যা আর নগর মিথিলা।
ভাগীরথী, সরস্বতী, যমুনা আইলা॥
পার হইয়া পূর্বমুখে যান তিন জনে।
মগধ রাজ্যেতে উতরিলা কত দিনে॥

বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক—এই পাঁচটি পাহাড়ের মাঝে রাজগৃহ।

পর্বত লঙ্ঘিয়া কৈল নগরে প্রবেশ।
সুরপুর সম দেখি জরাসন্ধ দেশ॥
হাট, বাট, চত্বরে সে-পুরী মনোহরা।
নগর ভিতরে বৈসে বিবিধ পসরা॥

তিনজন স্নাতক-ব্রাহ্মণের বেশে বরাবর গেলেন রাজবাড়ীতে। জরাসন্ধ ব্রাহ্মণ দেখে তিনজনকে যোড়হাতে অভ্যর্থনা জানালেন, তাদের বেশভূষা এবং দেহে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন দেখে বিস্মিত হলেন, মনে সন্দেহ জাগলো, বললেন—

পরিধানে বহুবিধ বিচিত্র বসন।
বিপ্রদেহে অস্ত্র চিহ্ন কিসের কারণ॥
সত্য কহ, তোমরা যে হও, কোন্ জাতি।
কি হেতু আইলা, বল, আমার বসতি॥

শ্রীকৃষ্ণ এবার নিজেদের পরিচয় দিলেন, বললেন—

পৃথিবীর রাজা সব বান্ধিয়া আনিলে।
পশুবৎ করিয়া রাখিয়াছ বন্দিশালে॥
মহাদেবে বলি দিবা শুনিনু শ্রবণে।
বল দেখি, হেন কর্ম করে কোন্ জনে॥
আপনার হিত যদি বাঞ্ছহ রাজন।
আমার বচনে, তবে, ছাড় রাজগণ॥
নহে যুদ্ধ কর রাজা মোদের সংহতি।
দুই কর্ম মধ্যে যেবা হয় তব মতি॥
জরাসন্ধ বলে, যদি ইচ্ছিলে মরণ।
রণ বাঞ্ছা করিলে করিব আমি রণ॥
ভীমের সহিত আমি করিব সমর।
এত বলি উঠিল মগধ দণ্ডধর॥
দুই গোটা গদা রাজা আনিল তখনি।
ভীমে দিল এক, এক লইল আপনি॥

তারপর সুরু হোল মল্লযুদ্ধ।—

অহর্নিশি চতুর্দশ দিবস সংগ্রাম।
নিঃশ্বাস ছাড়িতে দোঁহে না পায় বিশ্রাম॥

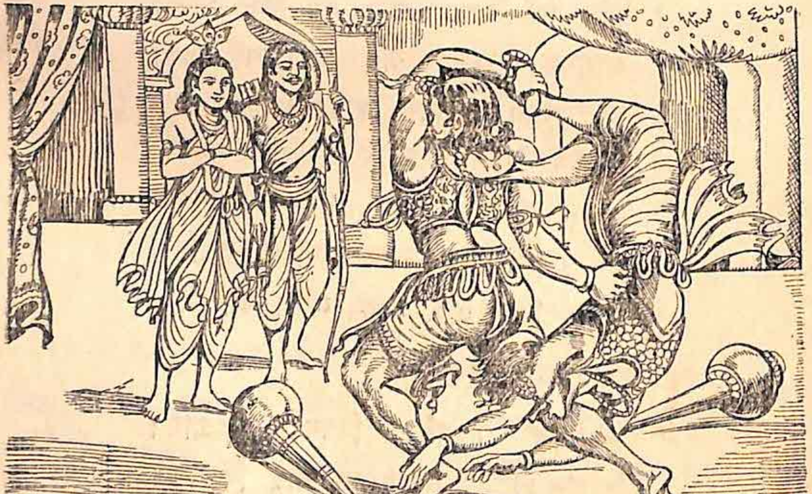
এবার জরাসন্ধ ক্লান্ত হয়ে পড়লো।

যথাশক্তি বৃকোদর করেন প্রহার।
তথাপি না হয় জরাসন্ধের সংহার॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ ইসারা করলেন—ভীমকে দেখিয়ে এক গাছি ঘাসকে চিড়ে দু'খানা করলেন। ভীম বুঝতে পারলেন। ভীম তখন—

এক পদ পদে চাপি এক পদে কর।
হুঙ্কারিয়া টানিলেন বীর বৃকোদর॥
মধ্যখান চিরিয়া করেন দুইখান।
জন্মকাল-অঙ্গ প্রাপ্তে হারাইল প্রাণ॥

জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে মগধের রাজা করে তিন ভাই ফিরে এলেন। এবার যজ্ঞের আয়োজন সুরু হোল। চারিদিকের রাজার কাছ থেকে কর আনতে হবে, এজন্য চার ভাই চারি দিকে যাত্রা করলেন—অর্জুন উত্তরে, ভীম পূর্বদিকে, নকুল পশ্চিমে, সহদেব দক্ষিণে।



অর্জুন নানা দেশ জয় করতে করতে অগ্রসর হলেন।—

প্রথমে প্রবেশ, কুলিন্দের দেশ,
হেলায় জিনিল তারে।
কালকূট-বর্ত্ম জিনিয়া আবর্ত,
সুমণ্ডল নৃপবরে॥
শকল সুদ্বীপে, প্রতিবিন্ধ্য নৃপে,
জিনিল ক্ষণেকে রণে।
প্রাগ্‌ জ্যোতিষ-ধাম, ভগদত্ত নাম
বিখ্যাত রাজা ভুবনে॥

অর্জুনের সঙ্গে তাঁর আট দিন যুদ্ধ হোল।

তারপর অর্জুন গেলেন কৈলাসে মানস-সরোবরে। সেখান থেকে আরো উত্তরে হরিবর্ষখণ্ড, ও আরো অনেক দেশে দিগ্বিজয় করে অর্জুন ফিরলেন।

ভীম প্রথমে গেলেন পাঞ্চালদেশে।—

তথা হইতে চলিলেন কুন্তীর কুমার।
বিদেহ নগরে যান গণ্ডকীর পার॥
সে দেশ জিনিয়া যান দশার্ণ প্রদেশে।
সুধর্মা নৃপতি আজি পূজিল বিশেষে॥
পুলিন্দের নরপতি সুমিত্রকে জিনি।
চেদীরাজ্যে প্রবেশিল পাণ্ডব বাহিনী॥
গৃহে লৈয়া শিশুপাল বহু যত্ন করি।
ত্রিদশ দিবস রাখিলেন নিজপুরী॥
অযোধ্যা নগরে রাজা দীর্ঘযজ্ঞ নাম।
তাহার সহিত বড় হইল সংগ্রাম॥

হেলায় জিনিয়া ক্রমে অনেক নৃপতি।
গিরিব্রজে শীঘ্র গেলা ভীম মহামতি॥
পুণ্ড্রাধিপ বাসুদেব কৌশিকীর কূলে।
তথাকারে গেল বীর চতুরঙ্গ দলে॥
তাহারে জিনিয়া রাজ্য পাইল বহুত।
বঙ্গেতে সমুদ্র-সেনে জিনে কুন্তীসুত॥
চন্দ্রসেন রাজারে জিনিয়া মহাবীর।
আর যত রাজা বৈসে সমুদ্রের তীর॥
দিগন্ত পর্যন্ত ভীম জিনি রাজগণ।
পুনঃ গেল ইন্দ্রপ্রস্থে লৈয়ে বহুধন॥

সহদেব গেলেন দক্ষিণ দিকে।—

শূরসেন, মৎসদেশ, গোশৃঙ্গ, কুন্তীভোজ, অবন্তী, বিদর্ভ, পাণ্ড্যদেশ, কিষ্কিন্ধ্যা, মাহিষ্মতী, ত্রিপুর, কৌশিক, স্বরাষ্ট্রভোজ, শূর্পাকরদেশ, সেতুবন্ধ পর্যন্ত জয় করে ফিরলেন। লঙ্কায় তখন বিভীষণ রাজ্য করছেন, তিনি সহদেবকে অনেক ধনরত্ন দিলেন।

নকুল গেলেন পশ্চিম দিকে।—

রোহিতক দেশে যেই আছিল নৃপতি।
প্রথমেতে যুদ্ধ হৈল তাহার সংহতি॥
সরস্বতী তটে ছিল যতেক রাজন।
সবারে জিনিল গিয়া মাদ্রীর নন্দন॥
একে একে সর্বদেশ জিনিয়া নকুল।
মদ্রদেশে গেল যথা আপন মাতুল॥
সমুদ্রের তীরে তবে গেল ম্লেচ্ছদেশে।
বড় বড় রাজগণ আনিলেন বশে॥

একে একে জিনিল সকল নৃপবর।
করদাতা করিয়া চলিল নিজ ঘর ॥

এবার যজ্ঞের আয়োজন হোল। যুধিষ্ঠির এক এক জনের উপর এক একটি কাজের ভার দিলেন।

কর্তব্যাকর্তব্য ভীষ্ম, দ্রোণে অধিকার।
দুর্যোধনে সমর্পিল সকল ভাণ্ডার ॥
ভক্ষ্য, ভোজ অধিকার দেন দুঃশাসনে।
ব্রাহ্মণ পূজার ভার গুরুর নন্দনে ॥
রাজগণ পূজা-ভার দিলেন সঞ্জয়ে।
দ্বিজেরে দক্ষিণা দিতে কৃপ মহাশয়ে ॥
দান দিতে দিলেন কর্ণের অধিকার।
আপনি নিলেন কৃষ্ণ পরিচর্যা-ভার ॥
রাজগণ আগমন জ্ঞাত করিবারে।
অধিকার দিল দুই মাদ্রীর কুমারে ॥

চারিদিক থেকে রাজারা এলেন—

উত্তরে হিমাদ্রি, পূর্বে সমুদ্র অবধি।
দক্ষিণেতে লঙ্কা, পশ্চিমেতে সিন্ধুনদী ॥
চতুর্দিক হৈতে আসে যত রাজগণ।
সভাদ্বারে উপনীত হৈল সর্বজন ॥
রাজসূয়-যজ্ঞবার্তা শুনিয়া শ্রবণে।
দেখিতে আইলা কত বিনা নিমন্ত্রণে।

এক বৎসরে যজ্ঞ শেষ হোল। ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দেওয়া হোল, এবার রাজাদের অর্ঘ দেবার পালা। যুধিষ্ঠির বললেন—সবার আগে কোন রাজাকে অর্ঘ দোব ?

ভীষ্ম বললেন—শ্রীকৃষ্ণকে, তিনিই সবার শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ দিতেই রাজা শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করতে সুরু করলো—

কোন্ রূপে পূজাযোগ্য হয় দামোদর।
কহ শুনি, অহে ভীষ্ম, সভার ভিতর॥
বড় দেখি পূজা যদি চাহ করিবারে।
দ্রুপদেরে ছাড়ি কেন পূজহ ইহারে॥
বিশেষ আছেন বসুদেব মহামতি।
পিতা স্থিতে পুত্রে পূজা, কহ কোন্ রীতি॥
যদি বা পূজিবে ইথে আচার্যের ক্রমে।
দ্রোণে ত্যজি কৃষ্ণে কেন পূজিলে প্রথমে॥
যদ্যপি বলিয়া ঋষি পূজিবে রাজন।
গোপালে পূজহ কেন ত্যজি দ্বৈপায়ন॥
রাজক্রমে পূজিবারে চাহ, নরবর।
দুর্যোধনে ত্যজি কেন পূজ দামোদর॥
যোদ্ধাজ্ঞানে পূজিবারে যদি ছিল মন।
কর্ণবীর ছাড়ি কেন পূজ নারায়ণ॥

ভীষ্ম বললেন—কৃষ্ণ পূজা করিবারে নিন্দে যেই জন।
সে জনারে মান্য না করিও কদাচন॥
অল্পবুদ্ধি শিশুপাল কিছু নাহি জানে।
কৃষ্ণপূজা নিন্দা করে তাহার কারণে॥

সহদেব রেগে বললেন—কৃষ্ণের পূজা যে সইতে পারে না, আমি তার মাথায় পদাঘাত করি।

এই কথায় শিশুপাল ও তার দলের রাজারা রাগে চীৎকার করে উঠলো— যজ্ঞনাশ কর আর মারহ পাণ্ডব।
কৃষ্ণ বংশ মার আর মারহ মাধব॥

ভীষ্ম তখন বললেন—শিশুপালের জন্মকালে চারিটি হাত ছিল আর তিনটি চোখ ছিল। বাপ-মা এঁকে দেখে ভয় পেয়ে পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, সেই সময় দৈববাণী হয়—

যেইজন এই শিশু করিবে সংহার।
দুই ভুজ লুকাইবে পরশে তাহার॥

রাজা সেইজন্য কোন লোক রাজবাড়ীতে গেলেই তার কোলে ছেলেকে তুলে দিতেন। শিশুপালের মা ছিলেন কৃষ্ণ-বলরামের পিসিমা। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যখন শিশুপালকে দেখতে গেলেন চেদীরাজ্যে তখন শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালকে কোলে নিতেই, তার দুটি হাত খসে পড়ে গেল, কপালের নয়ন অদৃশ্য হোল। শিশুপালের মা তখন বুঝতে পারলেন শ্রীকৃষ্ণের হাতেই পুত্রের মৃত্যু ঘটবে, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন— অবশ্য ক্ষমিব দোষ একশত বার।
তোমার অগ্রেতে, মাতা, করি অঙ্গীকার॥

শ্রীকৃষ্ণ তাই শিশুপালের অপরাধ বার বার ক্ষমা করেন, শিশুপাল জানেনা যে কার সঙ্গে সে বিরোধ করছে।

শিশুপাল তবু শুনলো না, শ্রীকৃষ্ণকে গালি দিল। শ্রীকৃষ্ণ তখন বললেন— বহু সহিলাম, আর সহিবারে নারি।
মৃত্যুপথ চাহে আজি এই পাপকারী॥

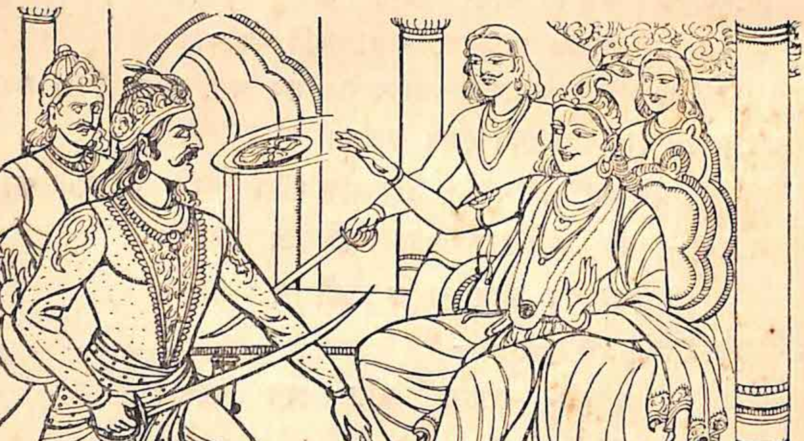
শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্র ছুড়লেন—

সুদর্শন মহাচক্র অগ্নি হেন জ্বলে।
শিশুপাল শির কাটি ফেলে ভূমিতলে॥

আর যত রাজগণ গর্জিবারে ছিল।
ভয়েতে আকুল হৈয়া সবে লুকাইল॥

এইভাবেই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ শেষ হোল। রাজারা একে একে সবাই চলে গেল। দুর্যোধন ও শকুনি আরো কিছুদিন রইল সভা দেখবার জন্য। এমন সভা তাঁরা কখনও দেখেননি, যত দেখেন ততই ধাঁধা লাগে।—

মাতুল সহিত বিহরয়ে নরবর।
স্ফটিকের বেদী দেখে যেন সরোবর॥
জল জানি নরপতি গুটায় বসন।
পশ্চাৎ জানিয়া বেদী লজ্জিত রাজন॥
স্ফটিক-মণ্ডিত বাপী ভ্রমে না জানিল।
স-বসন দুর্যোধন বাপীতে পড়িল॥
দেখিয়া হাসিল যত সব সভাজন।
ভীম পার্থ আর দুই মাদ্রীর নন্দন॥



দেখিয়া দিলেন আজ্ঞা রাজা ভ্রাতৃগণে।
ধরিয়া তুলিল বাপী হৈতে দুর্যোধনে॥
স্থানে, স্থানে প্রাচীরেতে স্ফটিক মণ্ডন।
দ্বারবোধে সেই দিকে চলে দুর্যোধন॥
ললাটে প্রাচীর বাজি পড়িল ভূতলে।
দেখিয়া হাসিল পুনঃ সভার সকলে॥
তাহা দেখি শীঘ্রগতি ধর্মের কুমার।
নকুলে পাঠায়ে দিল দেখাইতে দ্বার॥

দুর্যোধন ক্ষুব্ধ হয়ে সেইদিনেই হস্তিনাপুর যাত্রা করলেন।

পথে মামা-ভাগ্নেতে কথা হোল ঃ

দুর্যোধন বলে, মামা, কর অবধান।
হৃদয় দহিছে মম এই অপমান॥
পাণ্ডবের বশ হইল পৃথিবী মণ্ডল।
এক লক্ষ নরপতি খাটে ছত্রতল॥

শকুনি বললো—সসাগরা পৃথিবী খাটিল ছত্রতলে।
যতেক করিল তারা সব নিজ বলে॥
ইথে কেন তাপ তুমি করহ হৃদয়।
তব অংশ হইতে তারা কিছু নাহি লয়॥
দুর্যোধন বলে, আগে জিনিব পাণ্ডব।
পাণ্ডব জিনিলে মম বশ হৈবে সব॥
শকুনি বলিল, ভালো বিচারিলা মনে।
কিন্তু যুদ্ধে কে জিনিবে পাণ্ডু-পুত্রগণে॥

তখন শকুনি পরামর্শ দিল—

ক্ষত্র নীতি আছে হেন যদ্যপি আহ্বয়।
কিবা দ্যূতে, কিবা যুদ্ধে, বিমুখ না হয়॥

যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় নিমন্ত্রণ করে আনো, যুধিষ্ঠির খেলতে জানে না, জয় তোমার সুনিশ্চিত। বাজী রেখে খেললেই আমরা সব জিতে নোব।

কথাটা দুর্যোধনের মনে লাগলো। ধৃতরাষ্ট্রকে সব কথা জানিয়ে দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে নিমন্ত্রণ করলেন পাশা খেলতে। যুধিষ্ঠির চারভাই, দ্রৌপদী ও কুন্তীকে সঙ্গে নিয়ে হস্তিনাপুরে এলেন।

প্রথমে পাশা খেললেন শকুনি। বাজী রইল ইন্দ্রপ্রস্থের রত্নের ভাণ্ডার। যুধিষ্ঠির হেরে গেলেন।

আবার খেলা হোল। এবার বাজী হোল যত রথ আছে। যুধিষ্ঠির হারলেন।



আবার খেলা হোল। এবারকার বাজী যত হস্তী আছে। যুধিষ্ঠির হারলেন।

আবার খেলা—এবারকার বাজী যত সৈন্য আছে। যুধিষ্ঠির হারলেন।

বিদুর আর সইতে পারলেন না, ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—

এই শকুনিরে আমি ভালমত জানি।
কপট, কুবুদ্ধি, খলগন-চুড়ামণি॥
বিদায় করহ, ঘরে যাক আপনার।
উঠ, গো শকুনি, পাশা করি পরিহার॥

দুর্যোধন বললেন—উঠিয়া যথায় ইচ্ছা যাহ আপনার।
হেথায় রহিতে যোগ্য না হয় তোমার॥
সভামধ্যে যতেক কহিলা তুমি ভাষা।
অন্য হৈলে না থাকিত জীবনের আশা॥

আবার পাশা খেলা সুরু হোল। এবার যুধিষ্ঠির রাজ্য হারালেন। তারপর নকুল, সহদেব, অর্জুন ও ভীমকে একে একে হারিয়ে নিজেকে পণ করে যুধিষ্ঠির খেললেন। শেষে দ্রৌপদীকেও বাজী রাখলেন। সব গেল। পাঁচ ভাই হলেন দুর্যোধনের দাস, দ্রৌপদী হলেন দাসী।

আভরণ, পরিধান যতেক আছিল।
পঞ্চভাই আপনা আপনি সব দিল॥
সভাত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট ধূলাসনে।
অধোমুখে বসিলেন ভাই পঞ্চজনে॥

দুর্যোধন দারোয়ানকে বললেন দ্রৌপদীকে সভার মাঝে ধরে আনতে। দ্রৌপদী এলেন না। তখন দুর্যোধন দুঃশাসনকে পাঠালেন, বললেন—চুলের মুঠি ধরে নিয়ে এসো।

দুঃশাসন আসতেই তার ভাব-গতিক দেখে দ্রৌপদী ভয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে লুকালেন। কুন্তী ঘরের দরজা আটকে দাঁড়ালেন, দুঃশাসনকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু দুঃশাসন কোন কথা শুনলো না, কুন্তীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে সভার মাঝে নিয়ে এলো। দুর্যোধন হুকুম দিলেন—

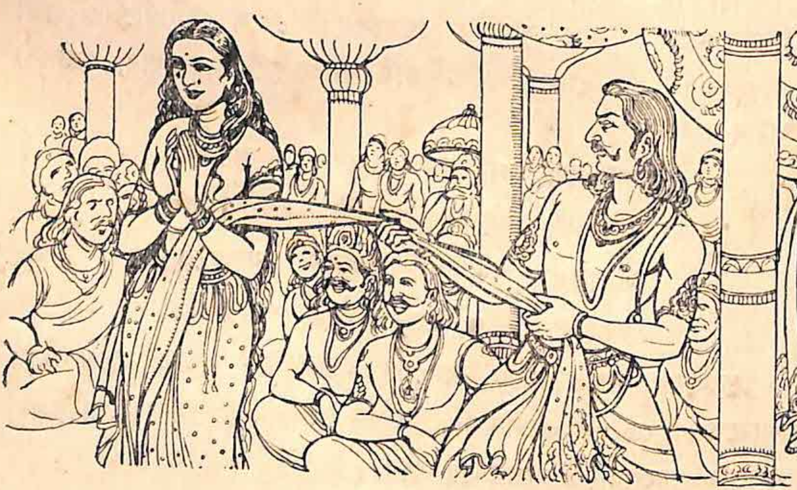
দ্রৌপদীর বস্ত্র আর যত অলঙ্কার।
ঝটিতি আনিয়া দেহ অগ্রেতে আমার॥

দুঃশাসন এই কথা শুনে দ্রৌপদীর কাপড়খানি পর্যন্ত কেড়ে নিতে গেল। সভায় সকলে চুপ করে রইলেন, কিন্তু দুর্যোধনের এক ভাই বিকর্ণ প্রতিবাদ তুললেন—এ অন্যায়!

দুর্যোধন বিকর্ণকে ধমক দিলেন।

এদিকে দ্রৌপদী—সঙ্কটে পড়িয়া দেবী না দেখি উপায়।
আকুল হইয়া কৃষ্ণা ডাকে—দেবরায়॥

দেবতা কৃপা করলেন। দুঃশাসন যত টানে দ্রৌপদীর কাপড় ততই বেড়ে যায়।



বিবিধ বর্ণের শাড়ী, দুঃশাসন ফেলে কাড়ি
পুঞ্জ পুঞ্জ হৈল স্থানে স্থানে।
পর্বত প্রমাণ বাস, দেখি লোকে লাগে ত্রাস,
চমৎকৃত হৈল সর্বজনে॥

অদ্ভুত দেখিয়া সভাজন হৈল স্তব্ধ।
সাধু সাধু দ্রৌপদী! চৌদিকে হৈল শব্দ॥

এবার ভীম গর্জন করে উঠলেন—এই দুঃশাসনকে—

রণমধ্যে ধরি বক্ষঃ করিয়া বিদার।
করিব শোণিত পান প্রতিজ্ঞা আমার॥

বিদুর তখন সবাইকে বুঝাতে চাইলেন, কিন্তু কেউ শুনলো না।

কর্ণ বললো—দাস হৈল যুধিষ্ঠির, তুই ভার্যা তার।
দাস-ভার্যা দাসী হয় বিদিত সংসার॥
দাসী হৈলে দাসী-কর্ম কর যথোচিত।
প্রবেশহ ধৃতরাষ্ট্র গৃহেতে ত্বরিত॥

দ্রৌপদী পাণ্ডবদের মুখের পানে তাকালেন। পাণ্ডবেরা কোন কথা বললো না। দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে অপমান করলেন, তারপর হাসতে হাসতে দ্রৌপদীকে পা দেখালেন। ভীম আর সইতে পারলেন না, আবার তর্জন করে উঠলেন—দুর্যোধনের ওই পা—

বজ্রসম নিদারুণ করি গদাঘাত।
রণমধ্যে ভাঙ্গি তাহা করিব নিপাত॥

এবার ধৃতরাষ্ট্র ভয় পেলেন। দৌপদীকে শান্ত করার জন্য বললেন—মা, তুমি শান্ত হও, তোমার কি চাই বল?

দ্রৌপদীকে ধৃতরাষ্ট্র দুটি বর দিলেন—প্রথম বরে যুধিষ্ঠির, এবং

দ্বিতীয় বরে ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব মুক্তি পেলেন। যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন—

আমা আর গান্ধারীর দেখিয়া বদন।
সব ক্ষম, যত দুঃখ দিল দুষ্টগণ॥
যাহ, তাত, নিজ রাজ্য কর অধিকার।
পালহ আপন দেশ প্রজা পরিবার॥

পাঁচ ভাই দ্রৌপদীকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন।

দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি কিন্তু সুস্থির হতে পারলেন না, তাঁরা ধৃতরাষ্ট্রকে গিয়ে বললেন—

দুর্যোধন বলে, তাত, অনর্থ করিলা।
বন্দী করি দুষ্ট সিংহ পুনঃ ছাড়ি দিলা॥
সৈন্য সাজাইতে তারা গেল নিজদেশ।
যুদ্ধ হেতু আসিবেক করি সমাবেশ॥
শুনিয়া অস্থির চিত্ত হৈল কুরুরায়।
বলে, কি হইবে বল কি করি উপায়॥
দুর্যোধন বলে, তাত, আছয়ে উপায়।
পুনঃ পাশা প্রবর্তিয়া করহ নির্ণয়॥
যে হারিবে দ্বাদশ বৎসর যাবে বন।
বৎসরেক অজ্ঞাত রহিবে এই পণ॥
ত্রয়োদশ বৎসর পাণ্ডব গেলে বন।
পৃথিবীর যত রাজা করিব আপন॥

ধৃতরাষ্ট্র সম্মত হলেন। গান্ধারী বললেন—

চরণে ধরিয়া, প্রভু, কহি যে তোমারে।
পুনঃ আজ্ঞা না কর পাণ্ডবে আনিবারে॥

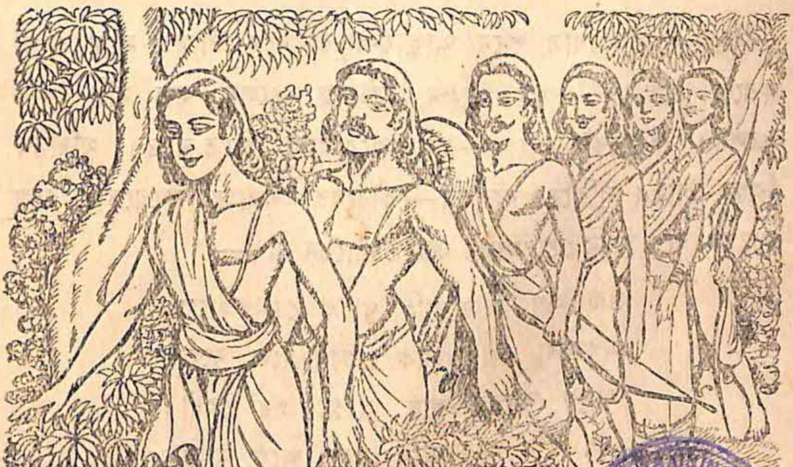
ধৃতরাষ্ট্র কারো কথা শুনলেন না, বললেন—

যে হউক, সে হউক, দৈবের লিখন।
আসিয়া খেলুক পুনঃ পাণ্ডুর নন্দন॥

আবার যুধিষ্ঠিরকে ডেকে আনা হোল। আবার পাশা খেলা হোল। আবার যুধিষ্ঠির হারলেন। পাঁচ ভাই দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে বনে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি তাঁদের উপহাস করতে লাগলেন, ভীম তখন দুর্যোধনকে বললেন—

এ সব বচন আমি করাব স্মরণ।
রণমধ্যে পরে তোরে পাইব যখন॥
তোরে সংহারিব তোর যত বন্ধু, সখা।
শত ভাই তোমার মারিব আমি একা॥
কর্ণেরে মারিবে পার্থ, গর্ব কর যার।
সহদেব শকুনিরে করিবে সংহার॥

কুন্তী রইলেন বিদুরের কাছে, পাঁচ ভাই ও দ্রৌপদী তেরো বছরের জন্য বনে চলে গেলেন।



বনপর্ব

পাণ্ডবেরা বনবাসে চললেন। অনেক ব্রাহ্মণ চললেন তাঁদের সঙ্গে, বললেন—এ অধর্মের রাজ্যে আর তাঁরা থাকবেন না। যুধিষ্ঠির তখন বিপদে পড়লেন, বললেন—এত লোককে আমি খাওয়াব কোথা থেকে?

পুরোহিত ধৌম্য সঙ্গে ছিলেন, তিনি বললেন—মহারাজ সূর্যের পূজা করুন, সব উপায় হবে।

রাজা সূর্যের পূজা করলেন, সূর্য বর দিলেন—

ত্রয়োদশ বৎসর যাবত রাজ্য হীনে।
যত চাহ, তত হবে মোর বর দানে॥
যাবৎ দ্রৌপদী দেবী না করে ভক্ষণ।
অক্ষয় রন্ধন-গৃহ রবে ততক্ষণ॥

পাণ্ডবদের বনবাস শুনে আত্মীয়-বন্ধুরা বনে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কৃষ্ণ এলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন এলেন, কত মুনি ঋষি এলেন। অনেকেই বললেন—যুদ্ধ করে রাজ্য জিতে নাও। যুধিষ্ঠির কিন্তু তাঁদের বুঝিয়ে বললেন—কৌরবেরা অন্যায় করেছেন বলে রাগের বশে তিনি তো অন্যায় করতে পারেন না।—

গুরু লঘু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধকালে।
অবক্তব্য কথা লোক ক্রোধ হলে বলে॥
আছুক অন্যের কার্য আত্মা হয় বৈরী।
বিষ খায় ডুবে মরে, অস্ত্র অঙ্গে মারি॥

সে কারণে বুধগণ সদা ক্রোধ ত্যজে।
অক্রোধ যে লোক তাঁহে সর্বলোক পূজে॥
ক্রোধে পাপ, ক্রোধে তাপ, ক্রোধে কুলক্ষয়।
ক্রোধে সর্বনাশ হয় ক্রোধে অপচয়॥
রাজ্য, ধন, পুত্র আর বহু যজ্ঞ দান।
সত্যের তুলায় নহে শতাংশ সমান॥
পুরুষ হইয়া যার বাক্য সত্য নয়।
ইহলোকে তারে কেহ না করে প্রত্যয়॥
এইক্ষণে প্রাণ আমি ছাড়িবারে পারি।
তথাপিহ সত্য আমি ত্যজিবারে নারি॥

ব্যাসদেব এলেন পাণ্ডবের সঙ্গে দেখা করতে। বনবাসের কষ্ট দেখে ব্যাসদেব বললেন—তোমাকে একটা বিদ্যা শিখিয়ে যাই—

এই বিদ্যা হতে হবে শিব দরশন।
তোমারে সদয় হইবেন ত্রিলোচন॥

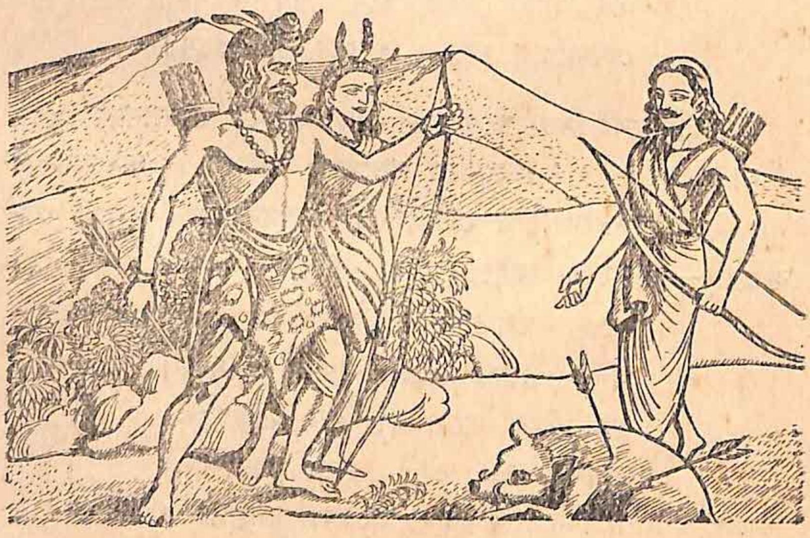
যুধিষ্ঠির সেই বিদ্যা শিখে নিয়ে পরে অর্জুনকে শেখালেন। সেই বিদ্যা শিখেই অর্জুন বাহির হয়ে পড়লেন। হিমালয়ে গন্ধমাদন পার হয়ে ইন্দ্রকীল পর্বতে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে অর্জুন তপস্যা সুরু করলেন—

সংযত হইয়া সেথা ইন্দ্রের নন্দন।
করেন তপস্যা আরাধিতে ত্রিলোচন॥
গলিত বৃক্ষের পত্র খান পক্ষান্তরে।
কত দিনে মাসেকেতে খান একবারে॥
কতদিন দুই চারি মাসে একদিনে।
কতদিন অর্জুন থাকেন বায়ুপানে॥

এক পদাঙ্গুলি ভরে রহেন দাঁড়ায়ে।
ঊর্দ্ধ দুই বাহু করি নিরালম্ব হয়ে॥

এমন সময় একদিন এক বরাহ তেড়ে এলো অর্জুনের পানে। অর্জুন তীর মেরে বরাহটি মেরে ফেললেন। অর্জুন তীর মারার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি তীর এসে বরাহের গায়ে বিঁধলো। এক কিরাত বন থেকে বেরিয়ে এলো, বললো—আমার শরেই বরাহ মরেছে।

অর্জুনের ভারী রাগ হোলো, কিরাতকে বাণ মারলেন। বাণ কিন্তু কিরাতের গায়ে লাগলো না। তূণের সব বাণ ফুরিয়ে গেল, তবু করাতের কিছু হোল না। তখন অর্জুন কিরাতকে জড়িয়ে ধরলেন, কত কিলচড় মারলেন, তবু কিছু হয় না। শেষে কিরাত যখন তাঁকে একটা ঘুসি মারলো, তখন অর্জুন অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। জ্ঞান হতে অর্জুন বললেন—দাঁড়াও, আগে আমি শিবের পূজা করে নিই, তারপর আবার লড়বো।



তারপর অর্জুন মাটির শিব গড়ে পূজা করতে বসলেন—

পূজিয়া মৃত্তিকা-লিঙ্গ দেন পুষ্পমালা।
সেই মালা বিভূষিল কিরাতের গলা॥
দেখিয়া অর্জুন হইলেন বিস্ময়।
নিশ্চয় জানিলা মনে এই মৃত্যুঞ্জয়॥
বিনয়ে কহেন পার্থ করি প্রণিপাত।
করিলাম দুষ্কৃতি যে, ক্ষম ভূতনাথ॥

শিব প্রসন্ন হলেন, অর্জুন তাঁর কাছ থেকে পাশুপাত অস্ত্র চেয়ে নিলেন।

তারপর ইন্দ্র অর্জুনকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন স্বর্গে। সেখানে দেবতাদের অবধ্য দৈত্য নিবাতকবচকে যুদ্ধে নিহত করলেন। গন্ধর্ব চিত্রসেনের কাছে গান-বাজনা শিখলেন। পাঁচ বছর স্বর্গবাস করে ফিরে এলেন পাণ্ডবদের কাছে।

দিনের পর দিন বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে পাণ্ডবেরা এলেন প্রভাসের কাছে কাম্যক বনে। দুর্যোধন সে সংবাদ পেলেন, তাঁর ভারী ইচ্ছা হোল যে তাঁর অতুল ঐশ্বর্য পাণ্ডবদের একবার দেখাবেন।—

যতদিন এ সম্পদ না দেখে পাণ্ডব।
লাগয়ে আমার মনে বিফল এ সব॥
ইন্দ্রের অধিক এই বিপুল বিভব।
দেখিয়া অন্তরে দগ্ধ হইবে পাণ্ডব॥

কিন্তু সেখানে যাওয়া যায় কি উপলক্ষে ?

কৌরবদের এক লক্ষ গরু ছিল দ্বৈত বনে। সেই গরুগুলিকে গোয়ালারা কেমন রেখেছে, সেই দেখতে যাবার ছল করে তাঁরা বাহির হয়ে পড়লেন।

এবার পাঁচ ভাই আত্মপ্রকাশ করলেন।—

দিব্য বস্ত্র, অলঙ্কার করেন ভূষণ।
মুকুট, কুণ্ডল, হার, অঙ্গদ, কঙ্কণ॥
বিরাট রাজের রাজ সিংহাসনোপরি।
শুভলগ্ন বুঝি বৈসে ধর্ম-অধিকারী॥
বাম ভাগে বসিলেন দ্রুপদ দুহিতা।
দক্ষিণেতে বৃকোদর ধরে দণ্ড, ছাতা॥
কর যোগে পুরোভাগে রহে ধনঞ্জয়।
চামর ঢুলায় দুই মাদ্রীর তনয়॥

বিরাট রাজা সভায় এসে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, বললেন—এ কী!

অর্জুন তখন একে একে নিজেদের পরিচয় দিলেন। বিরাট রাজা তো ভারী খুসি। নিজের কন্যা উত্তরার সঙ্গে অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুর বিবাহ দিলেন। বিরাট ধূমধাম হোল।—

পাণ্ডবের কথা শুনি যত বন্ধুগণ।
শ্রুতিমাত্র মৎস্য দেশে করিল গমন॥
দ্বারকা হইতে কৃষ্ণ সপ্তবংশ লয়ে।
আসিলেন শীঘ্রগতি গরুড়ে চড়িয়ে॥
আসিল পাঞ্চাল হ'তে দ্রুপদ রাজন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ পঞ্চ কৃষ্ণার নন্দন॥
সবারে করিয়া পূজা বিরাট রাজন।
উৎসব করিল তবে বিবাহ কারণ॥

উদ্যোগপর্ব

বিরাট রাজার বাড়ীতে পাণ্ডবদের সভা বসলো। পাশা খেলায় যে সর্ত—বারো বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাত বাস তো শেষ হোল, এবার রাজ্য ফিরে পেতে হবে। সবাই মিলে স্থির করলেন—ধৃতরাষ্ট্রের কাছে দূত পাঠানো হোক!

ধৌম্য গেলেন কৌরবদের সভায়, ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—

এখন পৈতৃক ভাগ উচিত যে হয়।
দিয়া প্রীত কর, রাজা, আমা সবাকায়॥
ভাই ভাই বিরোধেতে নাহি প্রয়োজন।
এই মত কহিলেন ধর্মের নন্দন॥

ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বলিলেন—

সবার সম্মান রাখ, শুন মম বাণী।
পাণ্ডবেরে দেহ পুনঃ তার রাজধানী॥

দুর্যোধন বলিলেন—

যে হৌক সে হৌক, তাত, ক্রোধ কর তুমি।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবে না দিব রাজ্য আমি॥

ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের কাছে সঞ্জয়কে পাঠালেন, বলে দিলেন—

অন্ধ দেখি দুর্যোধন আমা নাহি মানে।
যতেক কহি যে আমি, না শুনে শ্রবণে॥
আমার বচন সেই চিত্তে নাহি লিখে।
কর্ণ-দুঃশাসন-বাক্য শুধু মাত্র রাখে॥

দুর্যোধন রাজ্য নাহি ছাড়ি দিতে চায়।
বুঝি চিত্তে যাহা আসে কর, ধর্মরায়॥

এদিকে দুর্যোধন যুদ্ধের আয়োজন সুরু করলেন—

পাইয়া যুদ্ধের বার্তা চেদী বংশ পতি।
সাজিয়া আসিল সঙ্গে অশ্ব, গজ, রথী॥
ভগদত্ত রাজা আসে পেয়ে নিমন্ত্রণ।
অর্বুদ, অর্বুদ, সৈন্যে করিয়া সাজন॥
বৃহদ্বল রাজা আসে পাইয়া লিখন।
সঙ্গেতে আনিল সৈন্য কে করে গণন॥
শত ভাই সহ আসে কলিঙ্গ নৃপতি।
সাজিল অসংখ্য সৈন্য রথী মহারথী॥
দুই লক্ষ মত্ত গজ, তুরঙ্গ অপার।
লইয়া সুশর্মা আসে সহ পরিবার॥
একাদশ অক্ষৌহিণী এরূপে মিলিল।
দেখি দুর্যোধন চিত্তে সানন্দ হইল॥
অনুচরে আজ্ঞা দিল কৌরব-তনয়।
কুরুক্ষেত্রে কর গিয়া বিচিত্র আলয়॥
একাদশ অক্ষৌহিণী রহিবার স্থান।
শীঘ্রগতি কুরুক্ষেত্রে করিবে নির্মাণ॥

পাণ্ডবরাও প্রস্তুত হলেন—

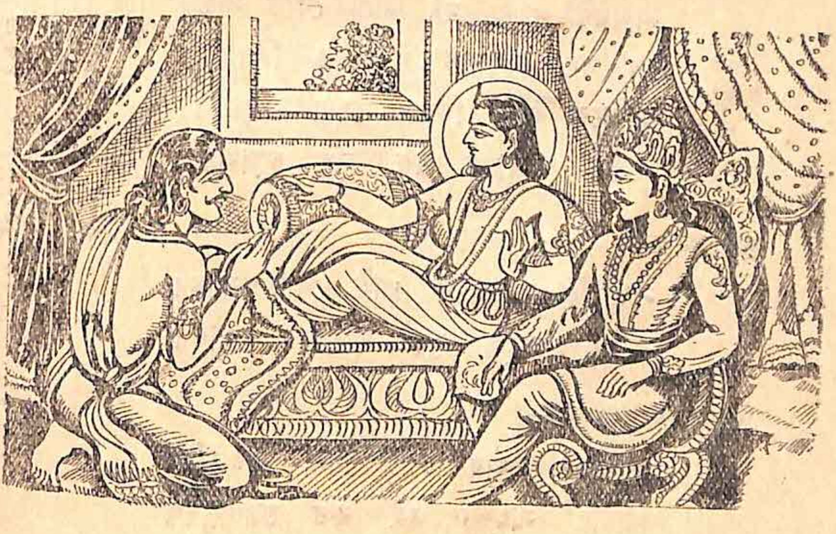
ধর্মশীল, বিষ্ণুভক্ত যতেক রাজন।
দূত মুখে পাণ্ডবের শুনি নিমন্ত্রণ॥
চতুরঙ্গ দলে সাজি কুরুক্ষেত্রে এল।
যুদ্ধের সামগ্রী সঙ্গে অনেক আনিল॥

সাত অক্ষৌহিণী পতি হৈল পঞ্চজন।
একাদশ অক্ষৌহিণী পতি দুর্যোধন॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হৈল দুই দলে।
না শুনি অপর কিছু সৈন্য কোলাহলে॥

এবার শ্রীকৃষ্ণকে নিজের দলে টানবার জন্য দুর্যোধন গেলেন দ্বারকায়। শ্রীকৃষ্ণ ঘরে ঘুমুচ্ছিলেন, তাঁর মাথার কাছে একটা সিংহাসন দেখে দুর্যোধন সিংহাসনে বসে ঘুম ভাঙার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

অর্জুনও সেই সময় গিয়ে পড়লেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে।—

অচেতন নিদ্রাগত দেখে নারায়ণ।
শিয়রে বসিয়া তাঁর রাজা দুর্যোধন॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া পার্থ যুক্তি করি মনে।
বসিলেন গিয়া কৃষ্ণ-চরণ আসনে॥



শ্রীকৃষ্ণের ঘুম ভাঙলো।—

কতক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হইল তাঁহার।
উঠিতে সম্মুখে দেখে কুন্তীর কুমার॥

অর্জুন বললেন—আপনি আমার রথের সারথি হবেন সেই আশায় আমি এসেছি!

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—বেশ!

তারপর মুখ ফিরিয়ে শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন দুর্যোধনকে। দুর্যোধন বললেন— বহুক্ষণ হৈল আমি আসিয়াছি হেথা।
পশ্চাৎ আসিল হেথা পার্থ মহারথা॥

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আগে তুমি আসিয়াছ জানিব কেমনে।
আগে আমি অর্জুনেরে দেখেছি নয়নে॥
সারথি করিয়া মোরে করিল বরণ।
উপায় ইহার কিবা করি দুর্যোধন॥
নারায়ণী সেনা মম আছে কোটি সাত।
মম সম তেজোবন্ত জগতে বিখ্যাত॥
আমাকে ইচ্ছহ কিম্বা, সেনা নারায়ণী।
নিশ্চয় আমাকে কহ, নৃপ চূড়ামণি॥

দুর্যোধন ভাবলেন—

নারায়ণী সেনা যদি পাই কোটি সাত।
করিব অতুল যুদ্ধ পাণ্ডবের সাথ॥

শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—

আমাকে সহায় দেহ সেনা নারায়ণী।
আমার সাহায্য এই কর চক্রপাণি॥

গোবিন্দ বলেন, রাজা, যে আজ্ঞা তোমার।
শুনি হৃষ্টচিত্ত হৈল, কৌরব কুমার॥

যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ হোল, যুধিষ্ঠির কিন্তু যুদ্ধ করিতে চাইলেন না।—তীর্থযাত্রা করি আমি ভ্রমিব কানন।
লউক সকল রাজ্য রাজা দুর্যোধন॥

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে অনেক বোঝালেন তখন যুধিষ্ঠির বললেন—শ্রীকৃষ্ণ যান্ দুর্যোধনের রাজসভায়, সেখানে গিয়ে দুর্যোধনকে বলবেন—

পঞ্চ ভাই পাণ্ডবেরে পঞ্চ গ্রাম দেহ।
সাগর অবধি রাজ্য সকল ভুঞ্জহ॥

শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনায় গেলেন।

ভক্তি করি দুর্যোধন রত্ন-সিংহাসনে।
সভামধ্যে বসাইল তবে নারায়ণে॥

আবার আড়ালে দুর্যোধন দুষ্ট মতলব করে রাখলেন—

কল্য কৃষ্ণ আসিবেন মোর অন্তঃপুরে।
দ্বারকা যাবেন তিনি কহিয়া আমারে॥
মহাপাশে সবে তাঁরে করিয়া বন্ধন।
যতনে রাখিবে হেথা করিয়া গোপন॥

পরদিন রাজসভায় শ্রীকৃষ্ণ কথা তুললেন—

অর্ধরাজ্য ছাড়ি যদি না দিবে রাজন।
পঞ্চ গ্রাম দিয়া শান্ত কর পঞ্চজন॥

দুর্যোধন তার উত্তরে বললেন—

তীক্ষ্ণ সূচী অগ্রদেশে ধরে যত ভূমি।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব আমি॥

আকাশ পড়য়ে ভূমে, পৃথি জলে ভাসে।
দিনকর তেজে যদি সপ্তসিন্ধু শোষে॥
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হবে খণ্ডন।
পাণ্ডবেরে ছাড়িয়া না দিব রাজ্যধন॥

তারপর শ্রীকৃষ্ণকে বেঁধে রাখার কথা। শ্রীকৃষ্ণ সভার মাঝে দুর্যোধনকে এমন ধমক দিলেন যে সভার মাঝে সকলেই স্তব্ধ হয়ে গেল শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—

কে কারে বাঁধিতে পারে দেখ বিদ্যমানে।
ক্ষমা করি শুধু মাত্র চাহি তোমা পানে॥
ক্ষুদ্র মৃগে মারে যথা কেশরী প্রচণ্ড।
নাগেরে গরুড় যথা করে খণ্ড খণ্ড॥
সেইরূপ দেখ আমি যত কুরুগণে।
মুহূর্তে মারিতে পারি যদি করি মনে॥

শ্রীকৃষ্ণ সভা থেকে উঠলেন, কেউ আর তাঁর পথ রোধ করতে সাহস করলো না।

পথে কর্ণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দেখা। শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

যুধিষ্ঠির নৃপতির তুমি সহোদর।
আপনি না চিন, কর্ণ, তুমি কি বর্বর॥
তোমার কনিষ্ঠ, পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভাই।
এহেন সম্বন্ধ কর্ণ, বড় ভাগ্যে পাই॥
যুবরাজ হবে তব রাজা যুধিষ্ঠির।
ধবল চামরে ব্যজনিবেক শরীর॥
মস্তকে ধরিবে ছত্র বীর বৃকোদর।
রথের সারথি হবে পার্থ ধনুর্ধর॥

বৃষ্ণিবংশ লয়ে তব পিছে যাব আমি।
এ সব সম্পদ, কর্ণ, ভোগ কর তুমি॥

কর্ণ তার উত্তরে বললেন—

যা কিছু কহিলে সব জানি নারায়ণ।
তথাপি প্রতিজ্ঞা নিজ করিব পালন॥
আমি যদি রাজ্য পাই দিব দুর্যোধনে।
সত্যভঙ্গ করিতে না লয় কভু মনে॥
নিশ্চয় জানি যে আমি পাণ্ডবের জয়।
সবান্ধবে দুর্যোধন হইবেক ক্ষয়॥
তথাপিহ না ত্যজিব রাজা দুর্যোধনে।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, জান, প্রতিজ্ঞা পালনে॥

এবার দু'পক্ষ কুরুক্ষেত্রে এসে সমবেত হলেন।

ধর্ম-আজ্ঞা পেয়ে ভীম, ইন্দ্রের নন্দন।
যথাস্থানে সমাবেশ করে সৈন্যগণ॥

আরেকদিকে—

শত ক্রোশ যুড়ি রহে কৌরবের সেনা।
রথ, রথী, গজ, বাজী, পত্তি অগণনা॥

যুদ্ধ আসন্ন। কুন্তী দেবী মহা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কর্ণ প্রতিদিন প্রাতঃকালে যমুনায় স্নান করে সূর্যের স্তব করতেন, কুন্তী এসে একদিন দেখা করলেন, বললেন—কর্ণ, তুমি আমার পুত্র—

যখন ছিলাম আমি জনকের ঘরে।
অতিথি সেবায়, তাত, রাখিয়া আমারে॥
অনেক সেবন কৈনু দুর্বাসা মুনিরে।
তুষ্ট হয়ে মহামুনি বর দিল মোরে॥

মন্ত্র পড়ি যেই দেবে করিবে আহ্বান।
সেই দেব আসিবেন তব বিদ্যমান॥
এত বলি মহামুনি গেল নিজস্থানে।
তবে আমি মন্ত্র পরীক্ষিতে একদিনে॥
কলসে আনিতে যাই যমুনার বারি।
কৌতুকে জপিনু মন্ত্র সূর্যে ধ্যান করি॥
ধ্যানমাত্র দিবাকর আসিলা তথায়।
তাঁর আশীর্বাদে আমি পাইনু তোমায়॥
প্রসব করিয়া তোমা সচিন্তিত মন।
কুমারীর কোলে জন্ম হইল নন্দন॥
লোকে খ্যাত হয় পাছে এসব কাহিনী।
যমুনায় ভাসাইনু তাম্রকুণ্ড আনি॥
তোমাকে পাইয়া রাধা করিল পালন।
কদাচিত নহ তুমি রাধার নন্দন॥

কর্ণ বললেন—জন্মকালে আপনি আমাকে ফেলে দিয়েছিলেন। মায়ের কাজ কিছুই করেননি। এখন আমি দুর্যোধনকে ছাড়তে পারি না।—

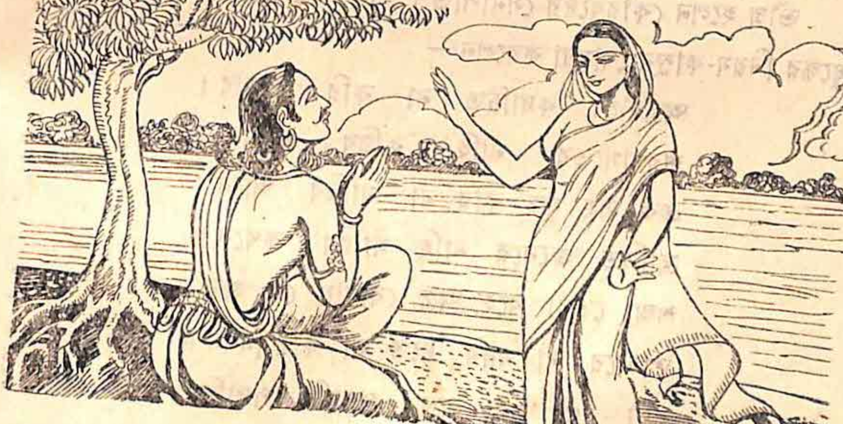
রাধার নন্দন বলি ঘোষে ত্রিভুবনে।
তব পুত্র বলি এবে বুঝাব কেমনে॥
তাহে দুর্যোধন মোরে যুবাকাল হতে।
নানা ভোগে পুরস্কারে, পালিল স্নেহেতে॥
বিশেষ পূর্বেতে আমি কৈনু অঙ্গীকার।
অর্জুনের সঙ্গে পণ সমর আমার॥

কুন্তী তখন বললেন—

তবে এক সত্য কর মোর বিদ্যমানে।
আর চারি পুত্রে মোর না মারিবে প্রাণে ॥

কর্ণ প্রতিজ্ঞা করলেন—

পঞ্চপুত্র রবে তব এই পৃথিবীতে।
অর্জুন সহিত কিম্বা আমার সহিতে ॥
না ভাবিহ দুঃখ, মাতা, যাহ নিজস্থানে।
এত বলি দণ্ডবৎ করিল চরণে ॥
বিদায় লইয়া কর্ণ গেল নিজপুরে।
যথাস্থানে গেল কুন্তী দুঃখিত অন্তরে ॥



ভীষ্মপর্ব

ব্যাসদেব এলেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে, অন্ধরাজা ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমি যুদ্ধের সংবাদ পাব কেমন করে ?

ব্যাসদেব সঞ্জয়কে দিব্য চক্ষু দিয়ে গেলেন, বললেন,—সঞ্জয় সব কিছু ঘরে বসেই দেখতে পাবে, সে তোমার পাশে থাকবে, তোমাকে সব ঘটনা বলবে।

সঞ্জয়ের মুখ থেকে ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধের সব ঘটনা শুনতে লাগলেন।

ভীষ্ম হলেন কৌরবদের সেনাপতি। তিনি যুদ্ধ সুরু হবার আগেই যুদ্ধের নিয়ম-কানুন ঘোষণা করলেন—

অস্ত্রহীনে কদাচিত না করি প্রহার।
শরণাগতের নাহি করিব সংহার॥
এক সহ যুদ্ধ করি না মারিব আনে।
ত্রাসিত জনেরে নাহি মারিব কখনে॥
শঙ্খ, ভেরী বহে, অস্ত্র যোগায় যে জন।
তাহারে না মারি, দূতে না করি নিধন॥
রথী রথী যুদ্ধ হবে, পদাতি পদাতি।
গজে গজে, অশ্বে অশ্বে, এই যুদ্ধ নীতি॥
সমানে সমানে যুদ্ধ, না মারিব হীনে।
আমার নিয়ম এই, শুন সর্বজনে॥

যুধিষ্ঠির রথ থেকে নেমে বরাবর চলে গেলেন কৌরব সৈন্যের মধ্যে, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাকে প্রণাম করলেন।

তুষ্ট হয়ে তিনজন আশীর্বাদ করে।
রণজয়ী হও, শত্রু বিনাশ সমরে॥

তারপর যুধিষ্ঠির উচ্চৈঃস্বরে কৌরবদের সম্বোধন করে বললেন—এখানে যদি আমার বন্ধু কেউ থাকেন তো আসুন, আমি তাকে বন্ধু-ভাবে গ্রহণ করবো।

এই কথায় দুর্যোধনের ভাই যুযুৎসু একলাখ সৈন্য নিয়ে যুধিষ্ঠিরের দলে যোগ দিলেন।

এবার যুদ্ধ সুরু হবার কথা, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথ কৌরব সেনার সামনে রাখলেন।

সর্ব অগ্রে পিতামহ, আচার্য, মাতুল।
ভ্রাতৃ, পুত্র, পৌত্র দেখিলেন নিজকুল॥

অর্জুন বললেন—রাজ্যে কার্য নাহি মম, বনবাসে যাব।
জ্ঞাতিনাশ, বন্ধুনাশ সহিতে নারিব॥

শ্রীকৃষ্ণ তখন বললেন—

জীর্ণ বস্ত্র ত্যজি যথা নব বস্ত্র পরে।
তথা এক তনু ছাড়ি অন্যেতে সঞ্চরে॥
শরীর বিনাশ হয়, নহে জীবনাশ।
শুন কহি ধনঞ্জয়, করিয়া প্রকাশ॥
যত সব বস্তু দেখ চতুর্দশ লোকে।
সকলই আমার মূর্ত্তি জানাই তোমাকে॥
পৃথিবীর মধ্যে লোক যতেক জন্ময়।
আপনার কর্মফলে সবে হয় ক্ষয়॥
নিমিত্ত মাত্রক হও সব্যসাচী তুমি।
সব সৈন্য দেখ বধ করিয়াছি আমি॥

তারপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বিশ্বরূপ দেখালেন—

শ্রীকৃষ্ণ দিলেন দিব্য চক্ষু অর্জুনেরে।
অর্জুন দেখেন বিশ্ব কৃষ্ণের শরীরে॥
করিলেন নারায়ণ বদন বিস্তার।
তাহাতে দেখেন পার্থ অখিল সংসার॥

এবার অর্জুন মনে শক্তি পেলেন, সংগ্রাম সুরু হোল।—

দুই দলে শঙ্খনাদ সিংহনাদ-ধ্বনি।
আগু হইলেন যত রথী নৃপমণি॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর শান্তনু নন্দন।
অর্জুন সম্মুখে আসে করিবারে রণ॥
ভীমসেন সহ যুঝে রাজা দুর্যোধন।
দোঁহে মহা বীর্যবন্ত মহাপরাক্রম॥
দ্রোণে ধৃষ্টদ্যুম্নে যুদ্ধ অতি ঘোরতর।
কাশীরাজ সহ কৃপাচার্যের সমর॥

কোন এক সময় অর্জুন ভীষ্মের দিক থেকে একবার দৃষ্টি ফিরিয়েছেন—সেই অবসর পেয়ে গঙ্গার কুমার।

রথী দশ সহস্রেরে করিল সংহার॥
রথী মারি, দর্প করি, জয় শঙ্খ দিল।
প্রথম দিনের যুদ্ধ সমাপ্ত হইল॥

দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে সেনাপতি হলেন বিরাটের ছেলে শঙ্খ। দ্রোণের সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড যুদ্ধ হোল। দ্রোণ তাঁকে ব্রহ্মাস্ত্রে নিহত করলেন।—

বড় অবিচার রণে করিলেন দ্রোণ।
শিশুর উপরে ব্রহ্ম-অস্ত্রের ক্ষেপণ॥

বুক পাতি রহে বীর হাতে ধনুঃশর।
ব্রহ্মা-অস্ত্র তেজে ভস্ম হৈল কলেবর॥
ব্রহ্মা-অস্ত্র তেজ তবে প্রত্যক্ষ হইল।
ক্ষণেক পার্থের দৃষ্টি তাহাতে পড়িল॥
সেই অবসরে বীর শান্তনু নন্দন।
রথী দশ সহস্রেরে করিল নিধন॥
জয়শঙ্খ বাজাইল, দিবা অবসান।
দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ হৈল সমাধান॥

তৃতীয় দিনে কৌরবেরা চঞ্চু ব্যূহ করলেন, পাণ্ডবেরা করলেন অর্ধচন্দ্র ব্যূহ। পাণ্ডবেরা সেদিন প্রচণ্ড যুদ্ধ করলেন।

সেদিনও ভীষ্মের সঙ্গে অর্জুনের সারাক্ষণ লড়াই হোল।—

বেলা অবসানে পার্থে ঘর্ম উপজিলে।
মুছিয়া ফেলেন ঘর্ম যাহা ছিল ভালে॥
সেই অবসরে ভীষ্ম গঙ্গার কুমার।
রথী দশ সহস্রেক নিল যমদ্বার॥
সিংহনাদ ছাড়ি জয় শঙ্খ বাজাইল।
সন্ধ্যা জানি যোদ্ধাগণ নিবৃত্ত হইল॥

চতুর্থ দিনে প্রচণ্ড যুদ্ধ করলেন কৌরব পক্ষে ভগদত্ত এবং পাণ্ডব পক্ষে ঘটোৎকচ—

দারুণ রাক্ষসী মায়া করয়ে প্রকাশ।
কভু থাকে রণ ভূমে, কখন আকাশ॥
পর্বত উপরে থাকি কভু অস্ত্র মারে।
অগ্নি রূপ হয়ে কভু সৈন্যেরে সংহারে॥

সেদিনও ভীষ্ম অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে অবসর পেয়ে দশ

হাজার সৈন্য বধ করলেন। পঞ্চম দিনে কৌরবরা সমুদ্র ব্যূহ রচনা করলেন পাণ্ডবেরা করলেন শঙ্গাট ব্যূহ।

সেদিন অর্জুনের পুত্র ইলাবন্ত প্রচণ্ড যুদ্ধ করলেন কিন্তু শেষে নিহত হলেন অলম্বুষ রাক্ষসের হাতে। ভীষ্মের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধও কম হোল না।— অগ্নিবাণ ছাড়িলেন পার্থ ধনুর্ধর।

শূন্য পথ রুদ্ধ করি বর্ষে বৈশ্বানর॥
দেখি বরুণাস্ত্র এড়ে গঙ্গার কুমার।
মুষল ধারেতে জল হয় অনিবার॥
অর্জুন মারেন বাণ পবন সঞ্চার।
জল উড়াইয়া সব করেন সংহ।
হেরি ক্রোধে সর্পবাণ এড়ে বীরবর।
লক্ষ লক্ষ ফণী ওঠে গগণ উপর॥
শিখিবান এড়িলেন ইন্দ্রের কুমার।
ধরিয়া সকল ফণী করিল আহার॥
পর্বত নামেতে অস্ত্র ভীষ্ম নিল করে।
লক্ষ লক্ষ গিরিবর যাহাতে সঞ্চারে॥
হুহুঙ্কার ছাড়ি বীর যুড়ে বজ্রবাণ।
যতেক পর্বত ভাঙ্গে বজ্রের সমান॥

এইভাবেই দিন শেষ হোল, কোন এক সময় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের পানে তাকিয়ে ছিলেন, সেই অবসরে ভীষ্ম দশ হাজার সেনা বধ করলেন।

ষষ্ঠ দিনে সহদেবের সঙ্গে শকুনি প্রচণ্ড যুদ্ধ হোল, শকুনি শেষে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো।—

সারথি সমরে গেল অশ্ব সহ কাট।
পলায় শকুনি ভয়ে নাহি চাহে বাট॥

ভীষ্ম সেদিন প্রচণ্ড যুদ্ধ করলেন। ভীষ্ম নারায়ণ—শর নিক্ষেপ করলেন—

বিষ্ণুতেজ ধরে অস্ত্র বিষ্ণু অবতার।
পাণ্ডবের অস্ত্রধারী করিতে সংহার॥
দেখিয়া পাইলা ভয় প্রভু নারায়ণ।
অর্জুনে চাহিয়া তবে বলেন বচন॥
অস্ত্র ধনু ত্যাগ কর, শুন বীরবর।
বিমুখ হইয়া বৈস রথের উপর॥
ধনু অস্ত্র ত্যজি বীর বসেন বিমুখে।
নারায়ণ ডাকি তবে বলেন সবাকে॥
পাণ্ডব সৈন্যেতে যত আছ অস্ত্রধর।
বিমুখ হইয়া বৈস ত্যজি ধনুঃশর॥
নৃপতি সহিত আর যত যোদ্ধাগণ।
বিমুখ হইলা সবে বিনা ভীমসেন॥
মহাতেজোময় অস্ত্র গগনে উঠিল।
পাণ্ডবের সৈন্যে অস্ত্রধারী না পাইল॥
ভীম হস্তে গদা দেখি কোপে আসে বাণ।
প্রজ্বলিত অগ্নি যেন পর্বত সমান॥
রথ ত্যজি ধাইলেন গোবিন্দ সত্বরে।
ভীমে আচ্ছাদিল দেব নিজ কলেবরে॥
মহাতেজোময় অস্ত্র সংসার ব্যাপিল।
কৃষ্ণের পরশে সব তেজ সম্বরিল॥
আপনার তেজঃ হরি আপনি ধরিয়া।
ভীমে রক্ষা করিলেন অস্ত্র নিবারিয়া॥

এবার ভীষ্ম পাঁচ বাণ মেরে অর্জুনকে আহত করলেন। অর্জুন

যখন নিজের দেহ থেকে সেই বাণ তুলছেন, সেই অবসরে ভীষ্ম দশ হাজার সৈন্য মেরে শেষ করলেন।

সপ্তম দিনে প্রথমে যুদ্ধ হোল ভীমের সঙ্গে অশ্বত্থামার।—

বাণাঘাতে অচেতন দ্রোণের কুমার।
দেখি সব কুরুগণ করে হাহাকার॥
শুনিয়া কলিঙ্গ শত সহোদর আগে।
ভীমেরে মারিতে যায় ধনু ধরি বেগে॥
তাহা দেখি বৃকোদর গদা হাতে লয়ে।
নিমেষেকে সবাকার নিল যমালয়ে॥
তবে বৃকোদর বীর মহাবেগে ধায়।
কলিঙ্গেরে যমালয়ে নিল এক ঘায়॥

এই দিনকার যুদ্ধে ভীষ্মের বাণে অর্জুন রক্তাক্ত হয়ে উঠলেন। এই দিনেও ভীষ্ম দশ হাজার পাণ্ডব সেনা বধ করলেন।

যুদ্ধ শেষে দুর্যোধন এলেন ভীষ্মের কাছে, বললেন—আপনার সমকক্ষ বীর জগতে নেই, আপনি সাতদিন যুদ্ধ করেও পাণ্ডদের মারতে পারলেন না, এ আপনার বীরত্বের কলঙ্ক।

ভীষ্ম বললেন—বেশ, কাল মহাকাল অস্ত্র দিয়ে আমি পঞ্চ-পাণ্ডবকে শেষ করবো!

চর মুখে পাণ্ডবেরা এই সংবাদ শুনলেন। তাঁরা দুর্ভাবনায় পড়লেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন—কোন ভয় নেই, অর্জুন তুমি আমার সঙ্গে চল!

চিত্রসেন গন্ধর্বের কাছ থেকে অর্জুন যখন দুর্যোধনকে মুক্ত করেছিলেন, তখন দুর্যোধন বলেছিলেন—'তুমি যা চাও আমি তাই দোব।' অর্জুন তার উত্তরে বলেছিলেন—'যখন দরকার বুঝবো,

তখন চাইব।' আজ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। অর্জুন বরাবর গেলেন দুর্যোধনের শিবিরে।

অর্জুন বলেন স্মর পূর্ব অঙ্গীকার।
মুকুট আমারে দিয়া সত্যে হও পার॥
শুনি দুর্যোধন নাহি বিলম্ব করিল।
মাথার মুকুট খানি অর্জুনেরে দিল॥

সেই মুকুট মাথায় দিয়ে অর্জুন গেলেন ভীষ্মের শিবিরে। অন্ধকারে ভীষ্ম তাঁকে দুর্যোধন বলে ভুল করলেন।

ভীষ্ম কহে, কহ শুনি রাজা দুর্যোধন।
এত রাত্রে কি কারণে হেথা আগমন॥
পার্থ বলিলেন, দেহ মহাকাল শর।
স্বহস্তে পাণ্ডবে বধি জিনিব সমর॥

ভীষ্ম বানটি অর্জুনের হাতে দিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ ঢুকলেন ভীষ্মের শিবিরে। ভীষ্ম এবার ব্যাপার বুঝলেন, কিন্তু যা দান করেছেন তা তো আর তিনি ফেরৎ নিতে পারেন না, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—

আমার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গি রাখিলে পাণ্ডবে।
তোমার প্রতিজ্ঞা কালি ভাঙ্গিব আহবে॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, ভারত-সমরে তিনি অস্ত্র ধারণ করবেন না। পরদিনকার যুদ্ধে ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করালেন।—সারথি শ্রীবাসুদেব, পার্থ ধনুর্ধর।

দোঁহারে বিন্ধিয়া ভীষ্ম করেন জর্জর॥
অস্থির হইয়া হরি কমল লোচন।
লাফ দিয়া রথ হতে পড়েন তখন॥

ক্রোধে রথচক্র ধরি সৈন্যের সাক্ষাৎ।
ভীষ্মেরে মারিতে যান ত্রিলোকের নাথ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হোল। অর্জুন দৌড়ে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ধরলেন। সেই অবসরে ভীষ্ম দশ হাজার সৈন্য মেরে শেষ করলেন।

নবম দিনে প্রচণ্ড যুদ্ধ হোল ভীমের সঙ্গে দ্রোণের। ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে আহত করে দশ হাজার সৈন্য মেরে শেষ করলেন।

পাণ্ডবেরা দেখলেন এভাবে যুদ্ধ চললে, কোনদিনই কৌরবদের জয় করা যাবে না। রাত্রে পাঁচ ভাই শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে গেলেন ভীষ্মের শিবিরে।

ভীষ্ম তাঁদের আশীর্বাদ করলেন—জয় হোক।

যুধিষ্ঠির বললেন—আপনি এভাবে যুদ্ধ করলে কি ভাবে আমাদের জয় হবে?

ভীষ্ম বললেন—ধর্ম অনুসারে জয় বেদের বচন।
শত ভীষ্ম হলে তারে নারে কদাচন॥
সশস্ত্র যদ্যপি থাকি সংগ্রাম ভিতরে।
কোন বীর শক্ত নহে জিনিতে আমারে॥
তবে ত তোমার রণে নাহি হবে জয়।
সে কারণে নিজ মৃত্যু কহিব নিশ্চয়॥
আমার প্রতিজ্ঞা যাহা শুনহ রাজন।
নীচ জনে অস্ত্র নাহি ধরি কদাচন॥
শিখণ্ডীকে আগে করি পার্থ ধনুর্ধর।
তীক্ষ্ণ বাণে বিন্ধে যেন মম কলেবর॥

পরদিন ভীষ্মের সামনে কেউ স্থির হয়ে যুঝতে পারছেন না দেখে শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের উপদেশ মত শিখণ্ডীকে ডেকে এনে রথে বসালেন। শিখণ্ডীকে দেখেই ভীষ্ম অস্ত্র ত্যাগ করলেন। তখন অর্জুন—

শত শত বাণ মারিলেন একেবারে।
ভীষ্মের কবচ ভেদি রক্ত পড়ে ঝরে॥
ধনঞ্জয় আপনার অস্ত্র বরষণে।
রোমে রোমে বিন্ধিলেন গঙ্গার নন্দনে॥
সর্বাঙ্গ ভেদিল অস্ত্র, স্থান নাহি আর।
সর্বাঙ্গ বহিয়া পড়ে শোণিতের ধার॥
বাণাঘাতে মহাবীর হয়ে হীন বল।
রথের উপর হতে পড়ে ভূমিতল॥
ভূমি নাহি স্পর্শে অঙ্গ শরের উপর।
হেনমতে শরশয্যা নিল বীরবর॥

যুদ্ধ থেমে গেল কৌরব ও পাণ্ডব ছুটে এলেন ভীষ্মের কাছে।

ভীষ্ম দুর্যোধনের পানে তাকিয়ে বললেন—মাথাটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে, একটা ব্যবস্থা কর।

শুনি দুর্যোধন রাজা ধাইল আপনে।
দিব্য উপাধান আনি দিল সেইক্ষণে॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শয্যা মম শর।
হেন উপাধান কোন হেতু, নৃপবর॥

তখন অর্জুনের পানে তাকালেন—

তবেত অর্জুনবীর লয়ে ধনুঃশর।
তিনবাণ মারি মাথা করেন সোসর॥

ভীষ্ম এবার জল চাইলেন—

এত শুনি দুর্যোধন অতি ব্যস্ত হয়ে।
সুবাসিত জল আনে ভৃঙ্গার পূরিয়ে॥

স্বর্ণের ভৃঙ্গার দেখি গঙ্গার নন্দন।
অর্জুনের পানে দৃষ্টি করেন তখন॥
তবেত অর্জুনবীর গাণ্ডীব ধরিয়া।
মারেন পৃথ্বীতে বাণ আকর্ণ পূরিয়া॥
পৃথিবী ভেদিয়া বাণ অধঃ প্রবেশিল।
ভোগবতী-গঙ্গাজল তথায় উঠিল॥
দুগ্ধধারা প্রায় পড়ে ভীষ্মের মুখেতে।
জলপান করে বীর পরম সুখেতে॥

এবার ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন—

ভাই ভাই বিরোধ না কর কদাচিত।
যুধিষ্ঠিরে ভাগ দিয়া করহ সম্প্রীত॥
দুর্যোধন বলে, মম প্রতিজ্ঞা না নড়ে।
বিনা যুদ্ধে সূচ্যাগ্র না দিব পাণ্ডবেরে॥
গঙ্গাপুত্র মহাবীর নীরব হইল।
কৌরব পাণ্ডব নিজ শিবিরে চলিল॥



দ্রোণপর্ব

একাদশ দিনে দ্রোণ হলেন কৌরবদের সেনাপতি। ভীম হলেন পাণ্ডবদের সেনাপতি।

দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধ হোল অর্জুনের।—

বাণাঘাতে দ্রোণাচার্য হন অচেতন।
দেখি হাহাকার করি ধায় কুরুগণ॥

ভীমের সঙ্গে হোল দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ।—

যুদ্ধ ত্যজি দুর্যোধন পলাইয়া যায়।
বৃকোদর বীর তার পাছে পাছে ধায়॥

তারপর কর্ণ এগিয়ে এলেন ভীমের সামনে।—

রথ চূর্ণ হইল কর্ণ পড়িল ভূতলে।
প্রাণ লয়ে পলাইল ত্যজি রণস্থলে॥

এই ভাবেই সেদিনের যুদ্ধ শেষ হোল।

দ্বাদশ দিনে প্রথমেই দুর্যোধন অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু— বাণাঘাতে দুর্যোধন হয়ে কম্পমান।
বেগে পলাইয়া যায় লইয়া পরাণ॥

তারপর এলেন অশ্বত্থামা—

বাণাঘাতে অশ্বত্থামা ব্যথিত হইল।
মূর্ছিত হইয়া বীর রথেতে পড়িল॥

আরেক দিকে হোল ভীমের সঙ্গে দুঃশাসনের যুদ্ধ। দুঃশাসন মার খেয়ে পলায়ন করলো।

এই ভাবেই সেদিনকার যুদ্ধ শেষ হোল।

ত্রয়োদশ দিনে দ্রোণ বললেন—নারায়ণী সেনা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করুক, সেই ফাঁকে আমি যুধিষ্ঠিরকে ধরে আনি।

দ্রোণ চক্রব্যূহ রচনা করে যুদ্ধ সুরু করলেন।

নারায়ণী সেনা নিয়ে অর্জুন ব্যস্ত, দ্রোণ সেই ফাঁকে এগিয়ে এলেন যুধিষ্ঠিরকে ধরতে।

চারি বাণে কাটি তার সারথির মুণ্ড।
চারি বাণে চারি অশ্ব কৈল খণ্ড খণ্ড॥
অচল হৈল রথ দেখি দ্রোণ বীরে।
ধরিবারে যান তবে রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
রাজার সঙ্কট দেখি ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
আগুলিল দ্রোণে আসি নির্ভয় শরীর॥

কিন্তু তিনি বেশীক্ষণ যুজতে পারলেন না—

বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন হইল মূর্ছিত।
ভূমেতে পড়িল বীর নাহিক সম্বিত॥
চক্রব্যূহে করি দ্রোণ করে মহারণ।
পার্থ বিনা ব্যূহ ভাঙ্গে নাহি হেন জন॥
হেনকালে মনেতে পড়িল আচম্বিত।
অভিমন্যু মহাবীরে ডাকেন ত্বরিত॥
যুধিষ্ঠির বলে, বাপু, শুনহ বচন।
ব্যূহ ভেদিবারে তুমি জান প্রকরণ॥
অভিমন্যু বলে, রাজা, করি নিবেদন।
প্রবেশ জানি যে কিন্তু না জানি নির্গম॥

যুধিষ্ঠির বললেন—তোমার পিছনে বড় বড় রথী থাকবেন, বেরুবার কথা ভাবতে হবে না।

অভিমন্যু অগ্রগামী হলেন।

ভীম আদি অন্য যত মহারথীগণ।
তাহার পশ্চাতে চলে করিবারে রণ।

অভিমন্যু ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করলেন, কিন্তু আর কেউ প্রবেশ করতে পারলেন না।

প্রথমেই অভিমন্যুর হাতে কর্ণের পুত্র বৃষসেন নিহত হলেন। তারপর কর্ণ বাণ খেয়ে মূর্ছা গেলেন। তারপর দুর্যোধনের পুত্র লক্ষ্মণ নিহত হলেন। তারপর—

বাণাঘাতে দুর্যোধন ব্যথিত অন্তর।
বেগে পলাইয়া যায় ত্যজিয়া সমর॥

তখন দুর্যোধন সবাইকে ডেকে বললেন—

মম বাক্যে তোমা সবে কর এই মতি।
এক কালে অভিমন্যু বেড় সপ্তরথী॥
দুঃশাসন, রাধেয়, শকুনি মম মামা।
দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য আর অশ্বত্থামা॥
আমিও যাইব তোমা সবার পশ্চাৎ।
এইরূপ করি তারে করহ নিপাত॥

অভিমন্যুকে এবার সপ্তরথী ঘিরে ফেললো—

কবচ কাটিল দ্রোণ, দ্রোণী কাটে ধনু।
দুঃশাসন কাটে রথ, সারথির তনু॥
কৃপাচার্য পুনঃ বাণে কাটে শরাসন।
দুর্যোধন কাটে অশ্বে মারি অস্ত্রগণ॥

চারিদিকে বীরগণ বরষয়ে বাণ।
বাণে অঙ্গ হৈল যেন সজারু সমান॥
অস্ত্রাঘাতে অভিমন্যু হৈল অচেতন।
হেনকালে আসে দুঃশাসনের নন্দন॥
আর্জুনি উপরে করে গদার প্রহার॥
দেখিয়া অমরগণ করে হাহাকার॥
অন্যায় সমর করি দুষ্ট দুর্যোধন।
সপ্তরথী বেড়ি পুত্রে করিল নিধন॥

সন্ধ্যাকালে যুদ্ধ শেষ করে অর্জুন ফিরে এলেন, অভিমন্যুর মৃত্যু সংবাদ শুনলেন, শুনলেন চক্রব্যূহে অভিমন্যু প্রবেশ করার পর আর কেউ ভিতরে প্রবেশ করতে পারেননি জয়দ্রথের জন্য। অর্জুন তখন প্রতিজ্ঞা করলেন—কাল আমি জয়দ্রথকে বধ করবো—

বিনা জয়দ্রথ বধে সূর্য অস্ত হয়।
করিব শরীর ত্যাগ জানিহ নিশ্চয়॥

পরদিন চতুর্দশ দিনের যুদ্ধে ভীম দুর্যোধনের নববুই জন ভাইকে বধ করলো। সঞ্জয়ের মুখ থেকে ধৃতরাষ্ট্র যখন সেই কথা শুনলেন, তখন—

কি বল, কি বল, বলি অন্ধ নরপতি।
মূর্ছিত হইয়া তবে পড়ি গেল ক্ষিতি॥
শুনিয়া গান্ধারী দেবী হৈলা অচেতন।
কহে বংশ নাশ কৈল পাণ্ডুর নন্দন॥
শত শত বধূগণ করয়ে রোদন।
টানিয়া ফেলয়ে নিজ বস্ত্র, আভরণ॥

এদিকে— অবশিষ্ট ছিল আর নয় সহোদর।
সবে লয়ে দুর্যোধন চলিল সত্বর॥

তখন ভীম— গদা হাতে করি ধায় পবন গমন।
রথ সহ সপ্তজনে করিল নিধন॥
কেবল রহিল দুর্যোধন, দুঃশাসন।
সমরে পড়িল আর সব ভ্রাতৃগণ॥

তখন কর্ণ এলো যুদ্ধে—

বাণে খণ্ড খণ্ড হৈল ভীমের শরীর।
সর্বাঙ্গ বহিয়া ধারে ঝরিল রুধির॥
অশক্ত হইল বীর সংগ্রাম ভিতরে।
দেখি শীঘ্রগতি কর্ণ ধরে বৃকোদরে॥

তখনই কর্ণ ভীমকে বধ করতে পারতেন, কিন্তু মনে পড়লো যে কুন্তীর কাছে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে অর্জুন ছাড়া আর কা'কেও তিনি বধ করবেন না, সুতরাং কর্ণ ভীমকে ছেড়ে দিলেন।

এদিকে অর্জুন জয়দ্রথকে সন্ধান করে ফিরছেন, কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পাচ্ছেন না।

মনে মনে চিন্তি তবে দেব নারায়ণ।
সুদর্শনে করিলেন সূর্য আচ্ছাদন॥
তবে জয়দ্রথ দেখি সন্ধ্যার সময়।
নিকটে আসিয়া অর্জুনের প্রতি কয়॥
আপন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করহ এখন।
তব যশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবন॥
অস্ত্র, ধনু ত্যাগ করি যাহ, ধনুর্ধর।
শীঘ্রগতি প্রবেশহ অগ্নির ভিতর॥

অর্জুন অগ্নিতে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত হলেন। ঠিক সেইসময়—

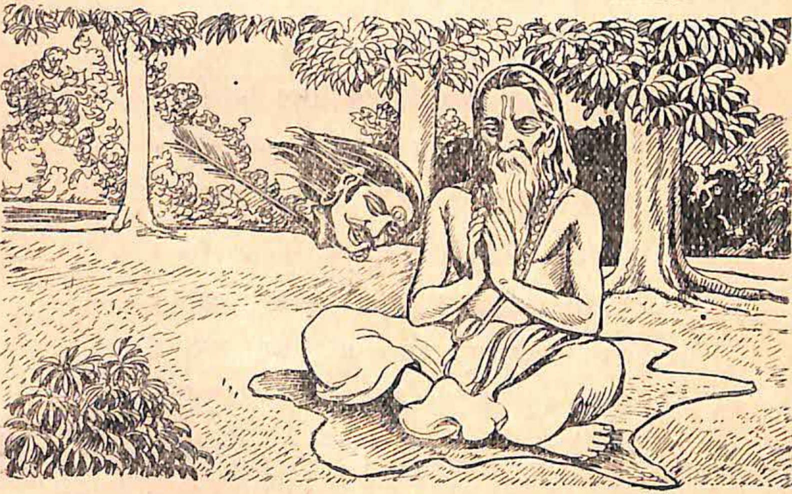
জয়দ্রথে দেখি কৃষ্ণ আনন্দিত মন।
সেইক্ষণে ছাড়িলেন সূর্য-আচ্ছাদন॥
দুইদণ্ড বেলা আছে গগন মণ্ডলে।
দেখিয়া হইল ত্রাস কৌরবের দলে॥

শ্রীকৃষ্ণ তখন বললেন—এবার জয়দ্রথকে মার, কিন্তু মনে রেখো—

পূর্বে এই জয়দ্রথ সেবিল শঙ্করে।
অনাহারে তপ করি বনের ভিতরে॥

শিব দেখা দিলেন—শঙ্কর বলেন, এই বর লহ তুমি।
সে মরিবে তব মুণ্ড যে ফেলিবে ভূমি॥

সেইজন্য— উহার জনক কাম্য বনে তপ করে।
ফেলাইবে মুণ্ড তার হাতের উপরে॥
এত শুনি ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান।
জয়দ্রথ ললাটেতে মারিলেন বাণ॥



শীঘ্রগতি মুণ্ড কাটি আর এক বাণে।
বাণে লয়ে গেল তার জনকের স্থানে॥
সন্ধ্যা করে সিন্ধুরাজ দুই হাত কোলে।
হেনকালে মুণ্ড তার হস্তে লয়ে ফেলে॥
ত্রাস পেয়ে মুণ্ড গোটা ভূমিতে ফেলিল।
সেইক্ষণে মুণ্ড তার খণ্ড খণ্ড হৈল॥
হেনমতে সিন্ধুরাজ হইল নিধন।
জয়দ্রথ সহ গেল যমের সদন॥

দুর্যোধন চঞ্চল হয়ে উঠলেন, বললেন—যুদ্ধ আর থামিয়ে দরকার নেই, রাত্রেও যুদ্ধ চলুক।

দুই দুই উল্কা ধরি রথের উপর।
নিশাকালে যোদ্ধাগণ করয়ে সমর॥

এবার ঘটোৎকচ প্রচণ্ড যুদ্ধ করলো—

কর্ণবীর, অশ্বত্থামা আর দুঃশাসনে।
একে একে ঘটোৎকচ পরাজিল রণে॥

রাক্ষস অলম্বূষ ঘটোৎকচের হাতে মারা পড়লো। দুর্যোধন তখন কর্ণকে বললেন একঘাতী বাণে ঘটোৎকচকে বধ করতে। কর্ণ এই বাণ রেখেছিলেন অর্জুনকে মারতে কিন্তু তা আর হোল না। সেই বাণ কর্ণ নিক্ষেপ করলেন ঘটোৎকচকে। সেই বাণ খেয়ে ঘটোৎকচ—

মৃত্যুকালে ঘটোৎকচ হৈল ভয়ঙ্কর।
দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ কৈল কলেবর॥
কুরুবল চাপিয়া পড়িল মহাশূর।
লক্ষ লক্ষ রথ, অশ্ব করিলেন চূর॥

এই একাঘ্নী বাণের একটা ইতিহাস আছে—

কর্ণের সমান দাতা নাহিক ভুবনে।
যে যাহা মাগয়ে তাহা দেয় সেইক্ষণে॥
ইহা জানি একদিন সহস্রলোচন।
উত্তরিল দ্বিজরূপে কর্ণের সদন॥

ইন্দ্র গিয়ে চাইলেন—তোমার কবচ কুণ্ডল আমাকে দান কর!

এই কবচ কুণ্ডল ছিল সহজাত, অক্ষয় ও অজেয়, তবু কর্ণ সেই কবচ কুণ্ডল ইন্দ্রকে দান করলেন।

কর্ণের সাহস দেখি দেব পুরন্দর।
তুষ্ট হয়ে বলিলেন, মাগি লহ বর॥
কর্ণ বলে, বর যদি দিবে, মঘবান।
এক-ঘাতী অস্ত্র, দেব, মোরে কর দান॥
কর্ণেরে একাঘ্নী অস্ত্র দিয়া পুরন্দর।
কবচ, কুণ্ডল লয়ে যান নিজ ঘর॥



বজ্রসম বাণ সেই নহে নিবারণ।
যাহারে প্রহারে তার অবশ্য মরণ।।

অর্জুনকে মারার জন্য কর্ণ সেই বাণ রেখেছিল। কিন্তু ঘটোৎকচকে সেই বাণ মেরে কর্ণ অস্ত্রহীন হলেন। অর্জুনকে মারার মত অস্ত্র আর কর্ণের কাছে রইল না।

পঞ্চদশ দিনের যুদ্ধে ভগদত্তের হাতে দ্রুপদ মারা পড়লেন, শিখণ্ডী মারা গেলেন অশ্বত্থামার হাতে, অর্জুন বধ করলেন ভগদত্তকে।

এদিকে দ্রোণ প্রচণ্ড সংগ্রাম করছেন।

যে বীর রণে পৈসে দ্রোণের সম্মুখে আইসে,
তারে দ্রোণ করয়ে সংহার।
যেন যুগান্তের যম, দেখি দ্রোণ কাল সম,
পাণ্ডবের নাহিক নিস্তার॥

এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ বললেন—অশ্বত্থামা মারা গেছে।

দ্রোণ চমকে উঠলেন, বললেন—তা হতে পারে না, ব্যাসদেব বর দিয়েছেন অশ্বত্থামা চার যুগ বাঁচবে।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—বেশ, যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করুন।

যুধিষ্ঠির বললেন—অশ্বত্থামা হত, ইতি গজ!

অর্থাৎ অশ্বত্থামা নামে একটি গজ মারা গেছে। কিন্তু 'ইতি গজ' কথাটি যুধিষ্ঠির এত আস্তে বললেন যে দ্রোণ শুনতে পেলেন না।

দ্রোণ পুত্রশোকে বিহ্বল হয়ে পড়লেন, সেই অবসরে ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়গ দিয়ে দ্রোণের মুণ্ডচ্ছেদ করলেন।

দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা এই সংবাদ পেয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন যে ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিনি এর প্রতিফল দেবেন।

কর্ণপর্ব

এবার কর্ণ হলেন কৌরবদের সেনাপতি।

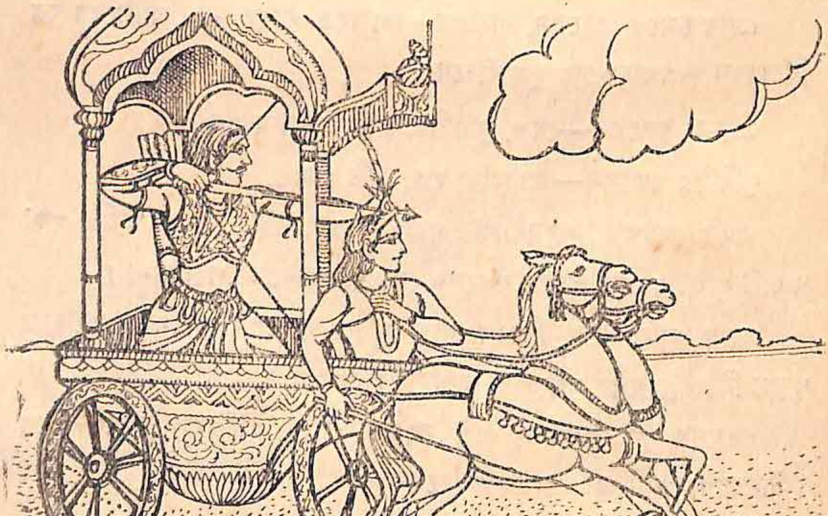
ষোড়শ দিনের যুদ্ধে কর্ণ প্রথমে নকুলকে পরাজিত করলেন।—

গলায় ধনুক দিয়া বান্ধিয়া রাখিল।
সবে দেখে নকুলের সঙ্কট হইল॥

কিন্তু কুন্তীর কাছে নিজের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে কর্ণ নকুলকে ছেড়ে দিলেন।

সপ্তদশ দিনের যুদ্ধে কর্ণের সারথি হলেন শল্য। প্রথমে কর্ণের হাতে পরাজিত হলেন যুধিষ্ঠির। তারপর দুঃশাসনের সঙ্গে ভীমের যুদ্ধ হোল।— তবে মহাকোপে ভীম গদা লয়ে হাতে।

যম সম নামিলেন সংগ্রাম ভূমিতে॥
গদা ফেলি মারে বীর দুঃশাসন শিরে।
দুঃশাসন পড়ে শত ধনুক অন্তরে॥



রণেতে পড়িল যদি দুষ্ট দুঃশাসন।
পূর্বের প্রতিজ্ঞা ভীম করিল স্মরণ॥
তবে ক্রোধে ভীমসেন বিক্রমে অপার।
খড়গ লয়ে বিদারিল হৃদয় তাহার॥
করিয়া শোণিত পান কহে বৃকোদর।
অমৃত পানেতে যেন ভরিল উদর॥
দুঃশাসন রক্ত তবে লয়ে বৃকোদর।
সেই রক্ত দিলা আনি দ্রৌপদী গোচর॥
রুধির পাইয়া দেবী আনন্দিত মন।
করিলেন আপনার কবরী বন্ধন॥

দুঃশাসন দ্রৌপদীকে মাথার চুল ধরে রাজসভায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল, সেইদিন থেকে আজ অবধি দ্রৌপদী চুল বাঁধেন নি।

তারপর লড়াই হোল কর্ণের সঙ্গে অর্জুনের। প্রচণ্ড যুদ্ধ চললো। সহসা কর্ণের রথের চাকা মাটিতে বসে গেল। কর্ণ রথ থেকে নেমে রথের চাকা তুলতে গেলেন সেই অবসরে অর্জুন নিরস্ত্র কর্ণকে বধ করলেন। সেদিনের মত যুদ্ধ শেষ হোল!



শল্যপর্ব্ব

এবার শল্য হলেন সেনাপতি।

শল্য যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিহত হলেন।—

হুঙ্কারি ছাড়েন শক্তি ধর্মের নন্দন।
লক্ষ্মণেরে শক্তি যেন এড়িল রাবণ॥
পড়িলেক শক্তি আসি শল্যরাজ বুকে।
মর্মাঘাতে পড়ে শল্য সংগ্রাম সম্মুখে॥

তারপর সহদেবের হাতে শকুনি নিহত হলেন।—

সন্ধান পূরিয়া যত শকুনি মারিল।
অনায়াসে সহদেব সকলি কাটিল॥
কাটিল সারথি, রথ করি লণ্ডভণ্ড।
তীক্ষ্ণবাণে কাটি পাড়ে তুরঙ্গের মুণ্ড॥
বিরথ হইয়া বীর পড়ে ভূমিতলে।
সংগ্রামে বিমুখ হয়ে পৃষ্ঠ দিয়া চলে॥
তবে সহদেব তারে চুলে ধরি আনে।
শকুনি দুঃখের মূল সর্বলোকে জানে॥
সহদেব বলে, তুমি দুষ্টের প্রধান।
এই হেতু তোমা প্রতি নহি ক্ষমাবান॥
কাতর শকুনি বীর করে ছটফটি।
ক্রোধে সহদেব তার মুণ্ড ফেলে কাটি॥

এবার—সৈন্যগণ ভঙ্গ দিল, যেবা ছিল শেষ।
একা দুর্যোধনমাত্র রহে অবশেষ॥

দুর্যোধন যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে গেলেন। পথে সঞ্জয়ের সঙ্গে দুর্যোধনের দেখা হোল; দুর্যোধন বললেন—

পিতা অন্ধ মহারাজ, জননী গান্ধারী।
পত্নী ভানুমতী, ভগ্নী দুঃশীলা সুন্দরী॥
সবারে কহিও তুমি মোর সমাচার।
ইহলোকে দেখা কভু নাহি হবে আর॥

দুর্যোধন চলে গেলেন দ্বৈপায়ন হ্রদে।

অষ্টাদশ দিনে যুদ্ধ শেষ হোল। কৌরবদের এক ভাই যুযুৎসু যুধিষ্ঠিরের শরণ নিয়েছিলেন, যুধিষ্ঠির তাঁকে পাঠালেন হস্তিনায়—

বিদুর সঞ্জয় আর যুযুৎসু তখন।
জনে জনে সবাকারে করেন সান্ত্বন॥

গদাপর্ব

দুর্যোধনকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। পাণ্ডবেরা তাঁর সন্ধান করছেন এমন সময় এক ব্যাধ এসে খবর দিল যে দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে কৃপাচার্য, কৃতবর্মা, অশ্বত্থামা ও দুর্যোধনকে একত্র বসে কথা বলতে সে দেখেছে।

পাণ্ডবেরা দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে এলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—দুর্যোধন জলের নীচে মায়া করে আছে—

তিরস্কার করি তুমি ডাকিলে তাহারে।
এখনি উঠিবে রাজা যুদ্ধ করিবারে॥

যুধিষ্ঠির তিরস্কার করতে সুরু করলেন—দুর্যোধন তা সইতে পারলেন না, জলের নীচে থেকেই বললেন—

হয়, হস্তী নাই মম নাহি সৈন্য আর।
সবে মাত্র গদা এক আছয়ে আমার॥
গদাযুদ্ধ করিবারে কর নিরূপণ।
আমার সহিত বল কে করিবে রণ॥

যুধিষ্ঠির বললেন—তুমি যার সঙ্গে ইচ্ছা লড়িতে পার।

শুনি দুর্যোধন বলে পাইয়া প্রবোধ।
গদাযুদ্ধ দিক মোরে ভীম মহাযোধ॥

দুর্যোধন জল থেকে উঠে এলেন। ভীমের সঙ্গে সুরু হোল গদাযুদ্ধ।

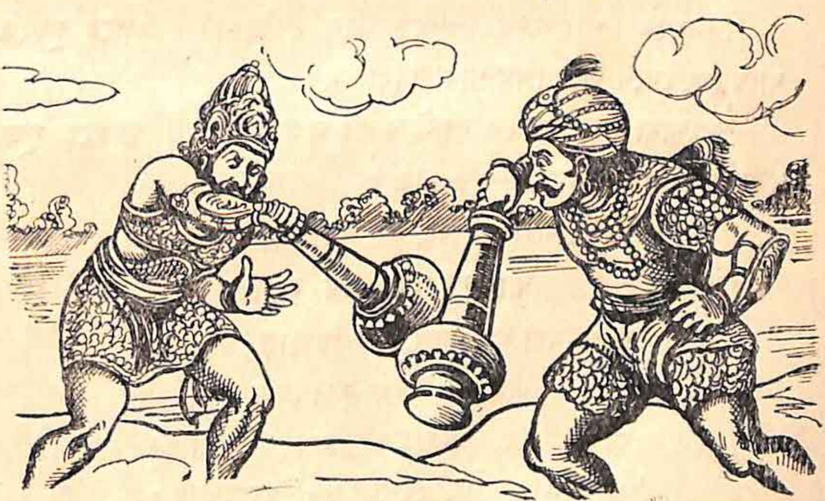
দুই মহাবলী গদা স্কন্ধে তুলি,
মণ্ডলী করিয়া ফিরে।
গদার প্রহার করে মহামার,
দুজনে দোঁহার পরে॥

ভীম সভার মাঝে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন দুর্যোধনের উরু ভাঙবেন, কিন্তু নাভির নীচে গদার আঘাত করা যুদ্ধের নীতি নয়। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে সেই ইঙ্গিত করলেন—

যবে গদা তুলি, করিয়া মণ্ডলী
ভ্রমে ভীম দুর্যোধন।
নিজ উরু তলে করাঘাত ছলে,
মারিলেন নারায়ণ॥

এবার ভীম যুদ্ধনীতি অমান্য করে দুর্যোধনের উরুতে আঘাত করাই ঠিক করলেন।

এক লাফ দিয়া শূন্যেতে উঠিয়া,
মারিব ভীমেরে গদা।
এই অনুমানি, কুরু নৃপমণি,
লাফ দিয়া উঠে তথা॥
দৈবের লিখন না যায় খণ্ডন,
দুর্যোধন লাফ দিতে।
ভীম-গদাঘাত, যেন বজ্রপাত,
বাজে তাহার উরুতে॥
দুই উরু ভঙ্গ হয়ে পড়ে কুরুপতি।
দুর দুর শব্দে ঘন কাঁপে বসুমতী॥
ভীম বললেন—সতী, সাধ্বী দ্রৌপদীর কৈলে অপমান।
তার ফল ভুঞ্জ, এবে, শুন, রে অজ্ঞান॥
এত বলি তার মাথে মারিলেক লাথি।
উরুভঙ্গে মানভঙ্গে স্তব্ধ কুরুপতি॥



সৌপ্তিকপর্ব

অন্ধকারে হ্রদের তীরে দুর্যোধন পড়ে আছেন।

হেনকালে কৃতবর্মা, কৃপ, অশ্বত্থামা।
নৃপতির কাছে রাত্রে আসে তিনজনা॥

অশ্বত্থামা বললো—এখনই সেনাপতি কর যদি মোরে।
পাণ্ডবে পাঠাব আমি শমনের ঘরে॥

দুর্যোধন অশ্বত্থামাকেই সেনাপতি করলেন।

বিদায় লইয়া তবে বীর তিনজন।
পাণ্ডব শিবিরে যায় সত্বর গমন॥
ঘোর অন্ধকার নিশা পথ নাহি চিনি।
ধীরে ধীরে চলি যায় শব্দ নাহি শুনি॥

তিনজনে পাণ্ডবদের শিবিরে এসে পৌঁছাল। ভিতরে ঢুকতে যাবে কি, দেখে দ্বারে শিব পাহারা দিচ্ছেন।

অশ্বত্থামা তখন শিবকে সন্তুষ্ট করার জন্য মাটীর শিব গড়ে পূজা করলেন। শিব বললেন—কি চাও?

দ্রৌণি বলে এই বর, দেহ, দেব দিগম্বর,
বাঞ্ছাপূর্ণ যেন মম হয়।
করি গিয়া শত্রু নাশ, দ্বার ছাড় কৃত্তিবাস,
এই বর দেহ মহাশয়॥
আর এক অনুগ্রহ কর শূলপাণি।
কৃপা করি দেহ মোরে তব খড়্গখানি॥

মহাদেব খড়গ দিয়ে চলে গেলেন। দ্বারে কৃপ ও কৃতবর্মাকে পাহারায় রেখে অশ্বত্থামা শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

প্রথমেই অশ্বত্থামা গিয়ে ধরলেন ধৃষ্টদ্যুম্নকে।—

হস্তপদ উদরেতে করায়ে প্রবেশ।
পশুবৎ করি তার ভাঙ্গে মধ্যদেশ॥
ভীম যেমন কীচকেরে করিল সংহার।
সেই মত করিলেক কুষ্মাণ্ড আকার॥

এইভাবে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়ে, অশ্বত্থামা গেলেন আর এক ঘরে।— এক ঠাঁই পঞ্চভাই ছিল অন্ধকারে।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ছিল একঘরে॥
হাত বুলাইয়া দেখে দ্রোণের নন্দন।
ভাবিল পাণ্ডব এই ভাই পঞ্চজন॥
মুখে বস্ত্র বান্ধি কাটে সবাকার শির।
একে একে পঞ্চ মুণ্ড কাটে দ্রোণি বীর॥
পঞ্চমুণ্ড লয়ে দ্রোণি চলে হরষেতে।
দোঁহাকার সঙ্গে আসি মিলিত দ্বারেতে॥

তিনজনে এলেন হ্রদের তীরে—

রাজা রাজা বলি ডাকে খোঁজে বহুতর।
শব্দশুনি কুরুরাজ দিলেন উত্তর॥

অশ্বত্থামা বললেন—

অবধানে শুন, এবে, রাজা দুর্যোধন।
মারিলাম তব শত্রু পাণ্ডুর নন্দন॥
পঞ্চ পাণ্ডবের মুণ্ড দেখহ সাক্ষাতে।
এক জন না রাখিনু পাণ্ডব সৈন্যেতে॥

সৃষ্টি নাশ হয় দেখে ব্যাস ও নারদ এসে দুই বাণের মাঝে দাঁড়ালেন, বললেন—সৃষ্টি নাশ পাবে অস্ত্র নিবারণ কর।

অশ্বত্থামা বললেন—এ অস্ত্র নিবারণ করার শক্তি আমার নেই তবে--

যেই পুত্র আছে উত্তরার গর্ভবাসে।
চলুক আমার অস্ত্র তাহার বিনাশে॥

অর্জুন বললেন—আমার অস্ত্র দ্রোণির শির না কেটে ফিরবে না।

ব্যাস বলিলেন, শুন বীর অশ্বত্থামা।
শিরোমণি দিয়া পার্থে তুমি চাহ ক্ষমা॥
শুনি অশ্বত্থামা মণি করিয়া ছেদন।
শীঘ্র গতি ধনঞ্জয়ে করে সমর্পণ॥

আরেক দিকে অশ্বত্থামার অস্ত্র উত্তরার গর্ভস্থ শিশুকে বধ করে ফিরে এলো।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বরিক শক্তিতে সেই শিশুকে আবার সঞ্জীবিত করলেন।

দ্রোণির মস্তক মণি লইয়া সত্বর।
কৃষ্ণার নিকটে যান বীর বৃকোদর॥

দ্রৌপদী বললেন—এই মণি মহারাজ করুন ধারণ।
তবে, ভীম, আরো তুষ্ট হয় মোর মন॥

সেই মণি যুধিষ্ঠিরের মস্তক-ভূষণ হোল।

স্ত্রীপর্ব

পুত্রশোকে ধৃতরাষ্ট্র কাতর হয়ে পড়লেন। বিদুর রাজাকে বোঝালেন—

উঠ, উঠ, মহারাজ সকল বিধির কাজ,
সবার মরণ মাত্র গতি।
যে দিন নিয়তি যার সেই দিন মৃত্যু তার,
কভু নাহি ঘুচে মহামতি ॥
সব সংহরয়ে কাল, নাহি তার কালাকাল,
মৃত্যুবশ সবে চরাচরে।
আমার বচন শুনি শান্ত হও নৃপমণি,
শোক আর না কর অন্তরে ॥

রাজা কিছুটা শান্ত হলেন। দেখতে দেখতে শ্রাদ্ধের সময় উপস্থিত হোল। অন্ধরাজা স্ত্রীপুরুষ সকলকে নিয়ে উপস্থিত হলেন কুরুক্ষেত্রে।

উচ্চৈঃ স্বরে কাঁদে সবে পতি-পুত্রশোকে।
প্রবোধ করিতে সবে নারে কোন লোকে ॥

পঞ্চপাণ্ডব এলেন অন্ধরাজার কাছে।

পঞ্চভাই কৃষ্ণ সহ গিয়া শীঘ্রগতি।
রাজার চরণে সবে করিল প্রণতি ॥

সহসা ধৃতরাষ্ট্র বললেন—

কোথা ভীম আইসহ দিব আলিঙ্গন।
তুমি মোর ঘুচাইলে পিণ্ড-প্রয়োজন ॥

উরু ভাঙ্গি দুর্যোধনে করিলে নিধন।
একে একে সংহারিলে শতেক নন্দন॥

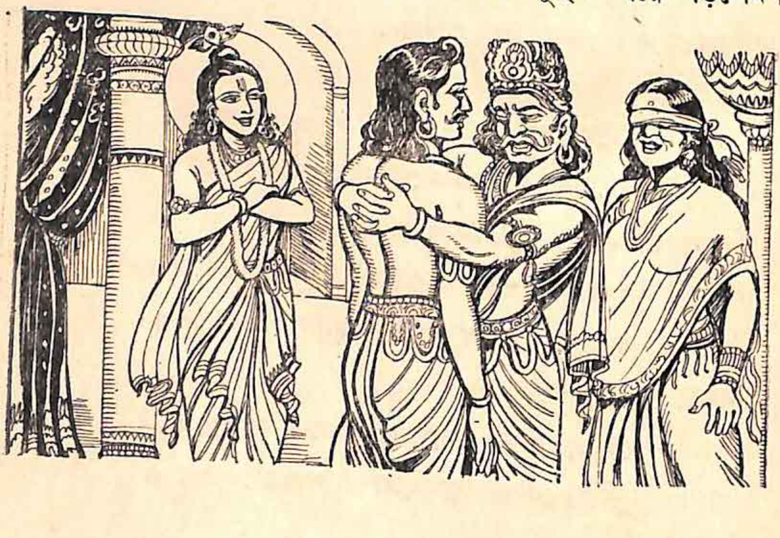
শ্রীকৃষ্ণ আগে থেকেই একটি লোহার ভীম তৈরী করে রেখেছিলেন, সেইটি এগিয়ে দিলেন।—

ধরিয়া লোহার ভীম চাপিল কোলেতে।
অযুত হস্তীর বল রাজার দেহেতে॥
ভাঙ্গিল লোহার ভীম, মহাশব্দ শুনি।
চূর্ণ হয়ে পৃথিবীতে পড়িল তখনি॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

তোমার জন্মিবে ক্রোধ ইহা অনুমানি।
গঠিত লোহার ভীম দিনু, নৃপমণি॥
বিষাদ না কর তুমি, শান্ত কর মন।
ভীমেরে মারিলে নাহি পাবে দুর্যোধন॥

যুদ্ধক্ষেত্রে গান্ধারী দুর্যোধনের মৃতদেহ দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।



জ্ঞান হলে গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দিলেন, বললেন—তুমি এই যুদ্ধের মূল, তোমার জন্যই তোমার পরামর্শেই পাণ্ডবেরা কুরুকুল ধ্বংস করেছে।—

পুত্রগণ শোকে আমি যত পাই তাপ।
তুমি সেরূপ পাবে দিনু অভিশাপ॥
মোর বধূগণ যথা করিছে ক্রন্দন।
সেই মত কান্দিবেক তব বধূগণ॥

তারপর সমস্ত মৃতদেহ অগ্নি সৎকার করা হোল। বহু রমণী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গেলেন।

কুন্তী এবার পাণ্ডবদের কাছে কর্ণের পরিচয় দিলেন। যুধিষ্ঠির আক্ষেপ করে বললেন—

এ সকল কথা যদি কহিতে, জননি।
তবে কেন বিনাশিব কর্ণ মহাজ্ঞানী॥
গুপ্ত করি রাখিলে, না কহিলে আমারে।
সে কারণে বধিলাম জ্যেষ্ঠ সহোদরে॥
হেন ভাই বধিলাম রাজ্যের লাগিয়া।
ধিক্ ধিক্! প্রাণ মম যাক বাহিরিয়া॥

ব্যাসদেব যুধিরষ্ঠিকে প্রবোধ দিলেন—

জন্মিলে মরণ আছে, জানে সব লোক।
জন্ম মৃত্যু হেতু, রাজা, না করিহ শোক॥
যাহার যেমত কর্ম, তার সেই গতি।
হেতুমাত্র মৃত্যু হয়, শুন নরপতি॥
শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা যথা হয় পরিবর্ত।
সেইমত দুঃখ, সুখ কালের বিবর্ত॥

পিতা মাতা আর যত দেখ পরিবার।
মনে বিচারিয়া দেখ, কেহ নয় কার॥
কার পুত্র কোন জন, কেবা কার পিতা।
কে কার জননী, কেবা কাহার বণিতা॥
পথিক সহিত যেন পরিচয় পথে।
সেই মত দিন কত থাকে এক সাথে॥
যে সব মরিল রণে জ্ঞাতি বন্ধুজন।
শোক কৈলে সে সবারে পাবে কি রাজন্॥
শোক ত্যজ মহারাজ, শান্ত কর মন।
হস্তিনাতে গিয়া কর প্রজার পালন॥

যুধিষ্ঠির শান্ত হলেন। যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষেক করার আয়োজন হোল।

শান্তিপর্ব

ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত, যুধিষ্ঠির সেখানে গেলেন, বললেন—

রাজ্যপদে নাহি আর মম প্রয়োজন।
ভীমে রাজ্য দিয়া আমি প্রবেশিব বন॥

ভীষ্ম তখন যুধিষ্ঠিরকে নানা উপদেশ দিলেন। বললেন—

পিতামাতা পুত্র বন্ধু কেহ কার নয়।
মরিলে সম্বন্ধ নাহি শুন, মহাশয়॥
এক হয়ে আসে জীব এক হয়ে চলে।
আমার আমার বলি মরয়ে বিফলে॥

মহাযজ্ঞ করি ভজ হরি দয়াময়।
জ্ঞাতি বধ পাপ আদি সব হবে ক্ষয়॥

সেইদিন—মাঘমাসের সীতাষ্টমী তিথিতে ভীষ্ম দেহত্যাগ করলেন।

শরীর ছাড়িল ভীষ্ম দেখি যুধিষ্ঠির।
রোদন করেন ভূমে লোটায়ে শরীর॥

অশ্বমেধপর্ব্ব

যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন—

সুহৃদ বান্ধবগণ যত মোর ছিল।
রাজ্যলোভে আমা হতে যমদ্বারে গেল॥
কি কর্ম করিলে মোর পাপ যায় দূরে।
অনুকূল হয়ে মুনি, কহিবে আমারে॥

ব্যাস বললেন—অশ্বমেধ যজ্ঞ কর।

ভীম সুলক্ষণ যুক্ত ঘোড়া সংগ্রহ করে আনলেন।

অর্জুন সেই ঘোড়া নিয়ে দিগ্বিজয় করতে বেরুলেন।

প্রথমে সেই ঘোড়া ধরলেন মাহিষ্মতী রাজ্যের রাজকুমার প্রবীর। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবীর নিহত হলেন। পুত্র শোকে রাণী জনা, গঙ্গার জলে ডুবে মরলেন।

তারপর রাণী প্রমীলা পাণ্ডবের ঘোড়া ধরলেন। কিন্তু অর্জুন রমণীর সঙ্গে যুদ্ধ করলেন না, মিষ্ট কথায় ঘোড়া ছাড়িয়ে আনলেন।

তারপর মণিপুর রাজ্যে চিত্রাঙ্গদার পুত্র বভ্রুবাহন অর্জুনের ঘোড়া ধরলো, লড়াই হোল। বভ্রুবাহনের হাতে অর্জুন জ্ঞান হারালেন।

জ্ঞান হলে বভ্রুবাহনের সঙ্গে অর্জুনের পরিচয় হোল,—সে অর্জুনেরই পুত্র।

এবার যজ্ঞের অশ্ব দিগ্বিজয় করে ফিরে এলো। অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন হোল।

আশ্রমিকপর্ব

একদিন ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বললেন—আমি বনে যাব—

রাজার নিয়ম এই আছে পূর্বাপর।
ক্ষত্রধর্ম বিধিনীতি, বেদের উত্তর॥
রাজা হয়ে করিবেক প্রজার পালন।
দান যজ্ঞ ব্রত নানা ধর্ম উপার্জন॥
শেষকালে তনয়েরে রাজ্যভার দিয়া।
বনবাস করিবেক যোগ আচরিয়া॥
ফলমূলাহারী হয়ে করিবে বসতি।
সমাধি সাধিয়া লভিবেক দিব্যগতি॥

ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী, বিদুর, সঞ্জয়কে নিয়ে বনে চললেন। কুন্তীও তাঁদের সঙ্গিনী হলেন।

গান্ধারীর স্কন্ধে আরোপিয়া বাম্যহাত।
ধীরে ধীরে চলিলেন কুরুকুল নাথ॥
গান্ধারীর যাম্য ভাগে চলিল সঞ্জয়।
আগে আগে চলিলেন ক্ষত্তা মহাশয়॥

হেনমতে অন্ধরাজ চলিল কানন।
দেখিবারে আইল সকল প্রজাগণ॥
বাল-বৃদ্ধ-যুবা ধায় কুলবধূগণে।
ধৃতরাষ্ট্র বেশ দেখি কান্দে সর্বজনে॥

গঙ্গার তীরে দ্বৈপায়ন বনে এসে তাঁরা কুটীর বাঁধলেন।—

এক গৃহে কুন্তী সঙ্গে সুবলনন্দিণী।
আর গৃহে বিদুর সঞ্জয় নৃপমণি॥
গৃহমধ্যে কুশাসন করিয়া স্থাপন।
পূর্বমুখে বসে রাজা করি যোগাসন॥
নিকটে বিদুর আর সঞ্জয় সুমতি।
যোগাসন করি দোঁহে করিলেন স্থিতি॥

সারাদিন এইভাবেই কাটে।—

দিন শেষে বিদুর সঞ্জয় দুইজন।
ফল মূল আনি সবে করেন ভক্ষণ॥

এদিকে হস্তিনায় পাণ্ডবেরা, কৌরব বধূরা দিনরাত কাঁদা-কাটা করেন। শেষে যুধিষ্ঠির একদিন সকলকে নিয়ে গেল অন্ধরাজার আশ্রমে। সেখানে সকলের সঙ্গে দেখা হোল কিন্তু বিদুরকে দেখতে পেলেন না। ধৃতরাষ্ট্র বললেন—

অনশত ব্রত করি ত্যজিয়া আহার।
একেশ্বর গেল ক্ষত্তা নিকটে গঙ্গার॥
চারিদিন আমা সহ নাহি দরশন।
জীয়ে কি না জীয়ে ভাই, কর অন্বেষণ॥

যুধিষ্ঠির তখনই গঙ্গাতীরে গেলেন। সেখানে বটগাছের নীচে

বসে বিদুর ধ্যান করছিলেন, যুধিষ্ঠির গিয়ে প্রণাম করতেই তিনি চোখ মেলে তাকালেন, এবং সেই মুহূর্তে দেহত্যাগ করলেন।

সেই সময় ব্যাসদেব এসে সবাইকে সান্ত্বনা দিলেন। গান্ধারী ব্যাসদেবকে বললেন—

এই বর মাগি দেব, তব পদতলে।
কৃপায় দেখাহ মোর তনয় সকলে॥

সকলেই এক বাক্যে ব্যাসদেবকে ধরে পড়লেন। ব্যাসদেবের ছিল অলৌকিক ক্ষমতা, রাত্রির অন্ধকারে সমস্ত মৃত আত্মীয় বন্ধুদের তিনি আহ্বান করলেন।—

ঊর্ধ্বদৃষ্টি করি তবে ব্যাস মুনিরাজ।
দুই হস্ত তুলি ডাকে যতেক সমাজ॥
কৌরব পাণ্ডব অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী।
ধনুর্বাণ, গদা, খড়্গ সহিত বাহিণী॥
সত্বর আইস সবে আমার বচনে।
বিলম্ব না করি এস এই তপোবনে॥

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্যোধনের সব ভাই, শকুনি, ঘটোৎকচ, অভিমন্যু, কুরুক্ষেত্রে যত জন মারা গিয়েছিলেন সকলে এসে দেখা দিলেন। ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে দৃষ্টি দান করলেন। তিনি সবাইকে দেখলেন। কত কথা হোল। সে কী আনন্দ!

রাত্রি প্রভাত হোল, পাণ্ডবেরা সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হস্তিনায় ফিরে এলেন।

তারপর কতদিন কেটে গেল। একদিন নারদ এলেন হস্তিনায়। যুধিষ্ঠির নারদ মুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয়ের কথা। নারদ খবর দিলেন—

মুনি বলে, নৃপতি, শুনহ সাবধানে।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা যজ্ঞ কৈল একদিনে॥
অগ্নির নির্বাণ না করিল রাজন।
সেই অগ্নি লাগিয়া দহিল তপোবন॥
ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, সঞ্জয়, তব মাতা।
চারিজন যোগাসনে আছিলেন তথা॥
অগ্নি দেখি অন্তর নহিল চারিজন।
সেই অনলেতে সবে হইল দহন॥

রাজবাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠলো।

মূষলপর্ব্ব

কয়েক বৎসর কেটে গেছে। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় এক যজ্ঞ করলেন। অনেক মুনি-ঋষি এলেন সেই যজ্ঞে। যজ্ঞ শেষে মুনিরা ফিরে যাচ্ছেন এমন সময় যদুকুলের ছেলেরা একটি মূষল নিয়ে খেলা করতে করতে তাঁদের বিদ্রূপ করলো। মুনিরা ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন—ওই মূষল থেকেই যদুবংশ ধ্বংস হবে!

বালকেরা ভয় পেল, শ্রীকৃষ্ণকে বললো সব কথা। শ্রীকৃষ্ণ তাদের বললেন— মূষল লইয়া যাহ প্রভাসের তীরে।
ঘষিয়া করহ ক্ষয় পাষাণ উপরে॥

ছেলেরা প্রভাসের তীরে গিয়ে ঘষে ঘষে মূষল ক্ষয় করে ফেললো। যখন সামান্য একটু আছে, সেটাকে জলে ফেলে দিল। জলে একটি মাছ সেই টুকরোটিকে গিলে ফেললো, জালে সেই মাছ ধরা পড়লো।

স্বর্গারোহনপর্ব

বহু বন পার হয়ে অনেক পর্বত।
দিবা নিশি যান হরি চিন্তি অবিরত॥
কত শত মুনি, ঋষি দেখি নানাস্থানে।
মেঘনাদ পর্বত পেলেন কতদিনে॥
উত্তর মুখেতে পুনঃ করেন প্রয়াণ।
কেদার পর্বতে তবে করে আরোহন॥
মেঘবর্ণ নামে গিরি অতি ভয়ঙ্কর।
আরোহেন পাণ্ডুপুত্র তাহার উপর॥
তথা হতে বহু নদ, নদী এড়াইয়া।
ভদ্রকালী নামে গিরি আরোহেন গিয়া॥

সেখানে কালী ও শিবের পূজা করে পাণ্ডবেরা গেলেন হরি পর্বতে।

মহা হিমে শীত ভেদি যান কতদূর।
পাছে পড়ি দ্রৌপদীর অঙ্গ হৈল চূর॥
অন্তকাল জানি দেবী চিন্তে নারায়ণ।
স্বামীগণ মুখ চাহি ত্যজিল জীবন॥

ভীম যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করলেন—দ্রৌপদী এভাবে মরলো কেন?

যুধিষ্ঠির বললেন—দ্রৌপদীর পাপ শুন কহি যে তোমারে।
সবা হতে বড় স্নেহ ছিল পার্থবীরে॥
তারপর— বদরিকাশ্রম দেখি পুলকিত মন।
উত্তর মূখেতে যান পাণ্ডুর নন্দন॥

তারপর রেবা-তীর্থে হিমে সহদেবের মৃত্যু হোল।

বৃকোদর বলে, রাজা কহিবে আমাকে।
কোন পাপে সহদেব পড়িল বিপাকে॥
যুধিষ্ঠির বলেন, যে শুন সাবধান।
সহদেব জ্ঞাত ভূত, ভাবী, বর্তমান॥
পাশাতে আমারে আবাহিল দুর্যোধন।
বিদ্যমান ছিল ভাই মাদ্রীর নন্দন॥
হারিব জিনিব কিবা ভাই তাহা জানে।
জানিয়া আমারে না করিল নিবারণে॥
বারণাবতেতে যবে দিল পাঠাইয়া।
মো' সবারে কপটে মারিতে পোড়াইয়া॥
না বলিল জানি ভাই কুলের বিনাশ।
অধর্ম হইল তেঁই, পাপের প্রকাশ॥

তারপর চন্দ্রকেলি পর্বতের উপর পড়লেন নকুল।

যুধিষ্ঠির বললেন—কর্ণের সমর হইল আমার সহিতে।
সেইকালে নকুল আছিল মম ভিতে॥
কর্ণের সংগ্রামে যবে মোর বল টুটে।
সহায় না হইল সে বিষম সঙ্কটে॥
যুদ্ধ না করিল ভাই আমার রক্ষণে।
এই পাপে পর্বতে পড়িল এইক্ষণে॥

তারপর নন্দিঘোষ পর্বতে প্রচণ্ড হিমে অর্জুন মারা পড়লেন।
ভীমের কথায় যুধিষ্ঠির বললেন—

ভূপতি বলেন, শুন পবন তনয়।
আমা হতে দ্রৌপদীর বশ ধনঞ্জয়॥

সবে হেয় জ্ঞান তার ছিল মনোগতে।
এই হেতু পার্থ বীর পড়িল পর্বতে॥

তারপর সোমেশ্বর পর্বতে ভীমের মৃত্যু হোল।

কোন্ পাপে বৃকোদর স্বর্গে নাহি গেল।
তবে রাজা পুনঃ এই মনেতে ভাবিল॥
বৃকোদর ভাই মোর ছিল লুব্ধমতি।
ভক্ষণে আছিল তার বড়ই পিরিতি॥
ভক্ষ্য দ্রব্য হেরি না রহিত স্থির মন।
দৃষ্টিমাত্র ইচ্ছা কৈত করিতে ভোজন॥
এই হেতু পাপ হৈল বীর বৃকোদরে।
না পারিল স্ব-কায়ে যাইতে স্বর্গপুরে॥

যুধিষ্ঠির স্থির চিত্তে এগিয়ে চললেন, এসে পৌঁছলেন স্বর্গের দ্বারে। ইন্দ্র এলেন ব্রাহ্মণের বেশ ধরে, যুধিষ্ঠির তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—স্বর্গ আর কতদূর?

ব্রাহ্মণ বললেন—স্বর্গে আমিই তোমাকে নিয়ে যাব!



ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরে কথা হয় হেনমতে।
তথা ধর্ম আইলেন কুক্কুর রূপেতে॥
শব্দ করি ব্রাহ্মণে খাইতে শ্বান যায়।
দণ্ড লয়ে ব্রাহ্মণ প্রহারে তার গায়॥
নির্ঘাত প্রহার করে কুক্কুরের দেহে।
পরিত্রাণ ডাকি শ্বান যুধিষ্ঠিরে কহে॥
ওহে পৃথিবীর রাজা মহা পুণ্যবান।
নির্দয় ব্রাহ্মণ বধে, কর পরিত্রাণ॥
কুক্কুরের বাক্যে রাজা উঠি যোড়হাতে।
বলেন বিনয় করি বিপ্রের সাক্ষাতে॥
নাহি মার কুক্কুরেরে, শুন, দ্বিজবর।
শুনিয়া বিপ্রের ক্রোধ বাড়িল বিস্তর॥
হাতে দণ্ড করি বলে নৃপতির প্রতি।
মোর হাতে কুক্কুরের নাহি অব্যাহতি॥
ভূপতি বলেন, রাখ কুক্কুরের প্রাণ।
মর্ত্যের অর্ধেক পুণ্য আমি দিব দান॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি ধর্ম হাসি মনে।
ধরিলেন নিজ মূর্তি রাজ বিদ্যমানে॥

তারপর ইন্দ্র ও ধর্ম দু'জনে যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে নিয়ে গেলেন।

সবে বলে, যুধিষ্ঠির, তুমি পুণ্যবান।
স্ব-কায়ে দেখিলে স্বর্গ দেব ভগবান॥

কিন্তু যুধিষ্ঠির কর্ণ ও ভাইদের সেখানে দেখতে পেলেন না। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আমার ভাইয়েরা কোথায় ? তাঁদের কাছে আমাকে নিয়ে চলুন।

দেবদূতেরা যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে গেল নরকে। অন্ধকার, পূতিগন্ধ ও আর্তনাদে যুধিষ্ঠির কাতর হলেন। সেখানে যুধিষ্ঠির কিছুই দেখতে পেলেন না, শুধু সাড়া পেলেন—আমি কর্ণ, আমি ভীম, আমি অর্জুন, আমি নকুল, আমি সহদেব, আমি দ্রৌপদী!

যুধিষ্ঠির তখন বললেন—আমার আত্মীয়েরা যদি নরকভোগ করে তাহলে আমিও এদের সঙ্গে নরকেই থাকবো, আমি যতই পুণ্যবান হই! আপনার জনকে ছেড়ে থাকবো না।

তখন শ্রীকৃষ্ণ এসে যুধিষ্ঠিরকে বললেন—তোমাকে নরক ভোগ করতে হবে না, তোমাকে শুধু নরক দর্শন করতে হল।—

কৌরব সহিত যবে হইল সমর।
মহাযুদ্ধ করিলেন দ্রোণ ধনুর্ধর॥
সঙ্কট দেখিয়া তবে মনে পেয়ে ভয়।
মিথ্যা বাক্য সমরে কহিলা মহাশয়॥
অশ্বত্থামা হত হৈল ইহা আমি জানি।
লঘুস্বরে "গজ ইতি" বলিলা আপনি॥
মিথ্যাবাক্য মহাপাপ, শুন নরপতি।
সেই মহাপাপ তব হৈল মহামতি॥

সেই পাপে তোমার নরক দর্শন হোল। তোমার ভাইদেরও কিছু কিছু পাপ ছিল সেইজন্যই তারাও এতদিন নরকভোগ করলো। এবার তোমরা সকলে স্বর্গে চল।

যুধিষ্ঠির এবার গিয়ে মন্দাকিনী জলে স্নান করলেন—

মনুষ্য হইয়া যদি তাহে স্নান করে।
দেবদেহ পেয়ে যায় বৈকুণ্ঠ নগরে॥

যুধিষ্ঠির দেবদেহ পেয়ে স্বর্গে আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে মিলিত হলেন।— কৃষ্ণের আদেশে রাজা পরিজন লয়ে।
রহেন হরির পুরে হরষিত হয়ে॥

মহাভারতের কথা হৈল সমাপন।
আনন্দেতে হরি, হরি, বল সর্বজন॥
কাশীদাস বিরচিল গোবিন্দ ভাবিয়া।
পাইবে পরম সুখ শুন মন দিয়া॥

